কত যে অপচয় করি, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। অনেকে বলেন, কোন বস্তুরই অপচয় হয় না। যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা পশু-পক্ষীতে আহার করে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে ও বহুদেশে শস্যের উৎপত্তির অভাবে খাদ্য-দ্রব্যের দৌর্মূল্য-হেতু সকল দেশেই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকেরই মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কিরূপ মিতব্যয়িতার সহিত সুদীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল আপনাদের আহারের সংস্থান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই শিক্ষার বিষয়। মিতব্যয়িতাই ইহার প্রধান মন্ত্র। আহার্য্যের অপচয়-নিবারক বিভাগ (Food Control Dept.) মিতব্যয়িতার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। অপচয়-নিবারণের জন্য তাঁহারা বড় বড় বিজ্ঞাপনে নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক ছবির দ্বারা মিতব্যয়িতার মহামূল্য উপদেশ-সমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য নানাস্থানে প্রচারিত করিয়াছেন। কাহারও গৃহের সম্মুখে এক টুকরা রুটী পড়িয়া থাকিলেই তাহার উপর রীতিমত শাস্তির বিধান করা হইয়াছে; জীবন-ধারণের জন্য বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীপুরুষের শরীর-পুষ্টির নিমিত্ত যে যে খাদ্যের যতটুকু প্রয়োজন তাহার পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেকের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এখনও সেই নিয়ম-অনুসারেই আহার-ব্যবস্থা চলিতেছে। এই সব স্থানে এখনও বিজ্ঞাপন দেখা যায়—"আহারের মিতব্যয়িতা-সম্বন্ধে তিনটী মহামূল্য উপদেশ :—যত্নের সহিত রন্ধন কর, ধীরে ধীরে আহার কর,—পুষ্টিকর কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও না।" "The three golden rules for food-economy—Cook carefully, Eat slowly—Waste nothing nutritious".

আমাদের আহার্য্য-নিরূপণের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য করে। ইহার দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান ও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা জানিতে পারি। আমাদের আহার্য্য বস্তুর উপাদান-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিই প্রধান—

১। Protein (e. g. Gluten)—পালাজাতীয় দ্রব্য। ময়দার আটা-ভাগ, অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে ময়দা ভিজাইলে আঁটাল হয়।

২। Albuminous (e. g. Gelatin) অণ্ডমধ্যস্থ শ্বেতাংশবিশেষ এবং উদ্ভিদ্ ও জৈব-দেহমধ্যস্থ তৎতুল্য পদার্থ।

৩। Carbohydrate (e. g. Sugar, starch)—চিনি, (মাড়). শ্বেতসার-জাতীয়।

৪। Fats (e. g. butter, oil etc)-তৈলাক্ত পদার্থ।

৫। Vitamins—খাদ্যের পচন-সাহায্যকারী পদার্থ। ইহার উপাদানগুলির তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। ইহা পচনের সাহায্যকারী, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় ইহা শীঘ্র নষ্ট হওয়া সম্ভবপর। খাদ্য-দ্রব্যে ইহারই অভাব বেরীবেরী-রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

৬। Mineral matters—খনিজ পদার্থ অর্থাৎ লবণজাতীয় দ্রব্য।

৭। Water—পানীয় জল।

উপরি উক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে প্রথম চারিটী অর্থাৎ Protein, Albumin, carbohydrate ও fats শক্তি-সঞ্চারক (supply energy) এবং শেষের দুইটী অর্থাৎ mineral matters ও water শরীর-বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণের সাহায্যকারী (Tissue builders.)।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ-দ্বারা আমাদের খাদ্য-সামগ্রী-সমূহের কোন্‌টীর দ্বারা উপরি উক্ত দুই কার্য্যের কতখানি সম্পাদিত হয়, তাহা জানা যায় এবং এই সকল পরিমাণকে খাদ্যের আহার্য্য-মূল্য (Food value), পুষ্টিসাধন-ক্ষমতা (Building power) ও শক্তিকারক পরিমাণ (energy value) বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। উপরি উক্ত উপাদানের যে কোন দ্রব্যের একগ্রাম (one gram) পরিমাণ দগ্ধ করিলে যতটা উত্তাপ পাওয়া যায়, সেই উত্তাপ-জনক ক্ষমতাকে calorific value বলা হয়।

পারিমাণিক খাদ্য-নির্দ্ধারণের জন্য কিংবা আহার্য্য-দ্রব্যের গুণানুসারে আহার্য্য ব্যবস্থার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।—

১। আমরা যে পরিমাণ খাদ্য আহার করি, তাহার সমস্তটা শরীরের ব্যবহারে আসে না; এবং শরীরেরই যা কোন্ অংশের আংশিক অসম্পূর্ণতা-পরিপূরণের জন্য ইহা ব্যবহার হইতে পারে।

২। খাদ্যের পরিপূরণশক্তি খাদ্যদ্রব্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তৈলাক্ত খাদ্যসমূহের পরিপূরণ শক্তি অধিক।

৩। পচন ক্রিয়ার সময় (পরিপাকের সময়) আহার্য্যের উপাদানগুলির যতটা শরীরে শোষিত হয়, সেই অনুসারে আহার্য্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

৪। ব্যক্তিগত খাদ্যে রুচি, হজমশক্তি, বয়স, জাতি ও শরীর অনুসারে খাদ্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

আহার্য্য-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথম, সকল প্রকার অপচয়-নিবারণ; যথা—ভাণ্ডারজাত আহার্য্য দ্রব্য, রন্ধন ও প্রস্তুত-করণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আহার্য্য-পরিমাণ এবং অনাবশ্যক আহার—এই সকলে অপচয়-নিবারণ।

ৰিতীয়তঃ,—সাম্য-আহার অর্থাৎ যাহাতে শরীর-বর্দ্ধনকারী আবশ্যক সকল দ্রব্যগুলিই বর্ত্তমান থাকে, প্রত্যেকেরই এইরূপ মিশ্রিত আহারের প্রয়োজন (mixed diet)। সাধারণতঃ দৈনিক আহারে লালাজাতীয় (Protein) ১২ ভাগ, শ্বেতসার (starch) ৫০ ভাগ, তৈলাক্ত পদার্থ (fats) ৫ ভাগ ও অবশিষ্ট খনিজ ও জলীয় পদার্থ আবশ্যক।

খাদ্যের লালাজাতীয় (Protein) উপাদানই প্রধানতঃ শরীরবর্দ্ধক; খনিজ ও জলীয় উপাদান তাহাকে সাহায্য করে। শ্বেতসার ও তৈলাক্ত খাদ্য প্রধানতঃ শক্তি-সঞ্চারক, কিন্তু সকল উপাদানই প্রত্যেককে সাহায্য করে।

দৈনিক খাদ্যের আবশ্যক পরিমাণ।

(লালাজাতীয়)—৪$\frac{৩}{৪}$ আউন্স
(চিনিজাতীয়)—১৭$\frac{১}{২}$ „ } উত্তাপজনক শক্তি ৩০০০ calorie

এক্ষণে আমাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যগুলির উপকরণ ও শক্তিপরিমাণ দেখা যাক্। আমরা সাধারণতঃ আমাদের খাদ্য দুইভাগে বিভক্ত

করিয়া থাকি—নিরামিষ ও আমিষ। আমাদের দেশে নিরামিষ খাদ্যবস্তুর সংখ্যাই অধিক এবং তাহার মধ্যে চাউল, গম, ভুট্টা, কলাই, যব, আলু, শাক-সব্জী, ফল, চা, চিনি ইত্যাদিই প্রধান। আমিষের মধ্যে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি। ইংরাজি মতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ আমিষের (animal food) মধ্যে গণ্য, কিন্তু ডিম্বকে অনেক সময় নিরামিষের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জীবন-ধারণের প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির গুণাগুণ নিম্নে বর্ণিত হইল।—

চাউল।—ভাতই আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য। ইহাতে উদ্ভিদ্-শ্বেতসার (শুদ্দমাড় starch) শতকরা ৭৬ ভাগ, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের পরিমাণ কম। শ্বেতসারের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার খুব ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এবং অন্ত্র-পথে (alimentary canal) গতির সময় ইহার সমস্তই প্রায় শরীরে শোষিত হয়। সেইজন্য ইহা একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করার পরিবর্ত্তে বাষ্পে সিদ্ধ করাই বিধেয়। কারণ, জলে সিদ্ধ করায় ইহার কতক পরিমাণ সারাংশ অতিরিক্ত জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের আবিষ্কৃত Icmic যন্ত্রের রন্ধন-প্রণালীতে বাষ্পদ্বারা সমস্ত রন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হয়। (ক্রমশঃ)

মেয়েদের কথা।

১। নারীর কৃতিত্ব।—ক্যানেডা রাজ্যের অন্তর্গত কলম্বিয়া-প্রদেশ হইতে মিসেস্ মেরি এলেন স্মিথ নামে এক মহিলা তথাকার মন্ত্রি-সভায় স্থান পাইয়া নারীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন রমণী এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্যাঙ্কুভার-নগরের প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্য হয়েন। সেই বৎসরেই তাঁহার স্বামী কোষাধ্যক্ষ রাল্‌ফ স্মিথের মৃত্যু হয়; তখন বহু জনের সম্মতিক্রমে তাঁহার পত্নী এলেন স্মিথকেই তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়। ক্যানেডার ইতিহাসে পার্লামেণ্ট সভায় স্ত্রীসভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন এই প্রথম, তা'ও আবার স্বামীর পরিবর্ত্তে।

পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুইবার নির্ব্বাচনে উঠিয়াছিলেন;—শেষের বার তাঁহার দিকে এত লোকে ভোট দিয়াছিল যে, এক-দিকে অত ভোট ক্যানেডার প্রাদেশিক ইতিহাসে আর কখন হয় নাই। কিছুদিন পরেই কলম্বিয়ার পার্লামেণ্ট-সভায় তাঁহাকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর কখনও এরূপ গুরুত্বব্যঞ্জক পদ কোন স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয় নাই। কিন্তু সভাধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে তিনি এ-প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন; কারণ, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিত। এক-মাসকাল পরে তিনি মন্ত্রিসভার সভ্য নিরূপিত হইলেন। সভ্য হইয়া তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য কয়েকটী সুবিধাজনক

আইন পাশ করান। দুঃস্থ জননীদের জন্য সরকারী বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। যে-সকল নারী বিলাতে বাস করিবার স্থান পায় না তাহাদিগকে ক্যানেডাতে আনাইয়া যাহাতে যথোপযুক্ত স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে ক্যানেডাতে একটী সমিতি আছে। এলেন স্মিথ তাহারও একজন সভ্য।

তাঁহার তিনটী সন্তান। তিনি খুব সাদাসিদে জিনিষের পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া "আমাদের মেরি এলেন" বলিয়া জানে।

২। স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলিত)।—ইয়োরোপে আজকাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যাইতেছে, সেটা নাকি পৃথিবীর অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুব প্রবল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আদিম মানব তাহার সমাজকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে-সকল নিষেধ-বিধির প্রচার করিয়াছিল, আজও কোথাও কোথাও সেই সকল বিধি লঙ্ঘন করিলে নরনারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই যে পরস্পরকে দূরে রাখিবার স্বাভাবিক ভাব, ইহার সৃষ্টির প্রধান কারণ বোধ হয়, স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষদের ঈর্ষা ও তাহাদের উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব করিবার অভিলাষ। দেখা যায়, কোন কোন বর্ব্বর জাতির স্ত্রীরা পুরুষদের এই প্রভুত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়া তাহাদের নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়াছে। এ বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধে যে প্রবেশ-নিষেধ আছে, তাহা অমান্য করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে, তাহাদের মাঠে লাঙ্গল দিবে কেবল পুরুষেরা; কোন স্ত্রীলোক এমন কি গোরু বাছুর স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পাইবে না। গ্রীণলণ্ডের এস্কিমোজাতির মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর কার্য্যে কিংবা স্ত্রী পুরুষের কার্য্যে কোন প্রকার সহায়তা করিলে তাহা একান্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হয়। বোর্নিয়োদ্বীপের আদিম অধিবাসিগণের বালকদিগের পক্ষে হরিণের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, উহা বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের খাদ্য। বালকরা সে খাদ্য খাইলে হরিণের মত ভীরুস্বভাব হইয়া পড়িবে, এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস।

স্ত্রীপুংের মধ্যে পার্থক্যবোধ অনেক সময় এত অধিকমাত্রায় পৌঁছিয়াছে যে, স্ত্রীজাতি ও পুরুষ-জাতির জন্য দুইটী বিভিন্ন ভাষার পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য আমেরিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ক্যারিব-নামে এক বন্যজাতির নিবাস আছে। তাহাদের পুরুষের সহিত কথা বলিতে হইলে একরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়;—সে কথা পুরুষে পুরুষেই হউক আর স্ত্রীতে পুরুষেতেই হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।—আবার স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে হইলে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করে; পুরুষেরাও যখন কোন স্ত্রীর কথার পুনরুক্তি করে, তখন স্ত্রীদের সেই ভাষাই ব্যবহার করে। আমাদের দেশেও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ভাষা-ভেদ দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতে নারীগণের পক্ষে শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাই বিহিত হইয়াছে; সংস্কৃত-ভাষা তাহাদের সকলের উপযোগী নহে।

নরনারীর এই পরস্পরকে দূরীকরণের

ইচ্ছা তাহাদিগের আহারেও দেখা যায়। বিবাহ হইলে নরনারী পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের গণ্ডিকে অতিক্রম করে; এজন্য বিবাহোৎসবে স্বামী-স্ত্রী তাহাদের জীবনে একটীবার মাত্র এক সঙ্গে আহার করে। কোন কোন দেশে বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, কখন বা পরস্পরের রক্ত-পান করে অথবা পরস্পর পরস্পরের রক্তে 'টীকা' দেয়। তাহাদের এই ধারণা যে, এরূপ অনুষ্ঠান স্বামী-স্ত্রীর প্রভেদ লুপ্ত করিয়া দিবে ও স্বতঃই তাহাদের অন্তর্মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

৩। মহিলা ভ্রমণকারিণী।—মিসেস্ রোজিটা ফরবেশ-নাম্নী একজন ইংরাজ-মহিলা সম্প্রতি উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তঁহার পূর্ব্বে কোন শ্বেতকায় মহিলাই এই স্থান দর্শন করেন নাই এবং প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একজন জার্ম্মাণ পরিব্রাজক এই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিসেস্ ফরবেস এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া সেখানকার রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে একটী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই ভ্রমণে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; কয়েকবার ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার জল ফুরাইয়া যায়; দুই-দিন অসহ্য জলকষ্টের পর তৃতীয় দিনে একটী কূপ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের প্রাণরক্ষা হয়। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব, পথপ্রদর্শকের পথভ্রান্তি, অধিবাসিগণের শত্রুতা প্রভৃতি নানা বিপদে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার অসভ্যেরা তাঁহার তাঁবু আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে একটি ভোজ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া সেই-দেশ দেখিবার অনুমতি লাভ করেন। মিসেস্ ফরবেস তাঁহার সহিত ক্যামেরা লইয়া গিয়া সেই দেশের অনেকগুলি ছবি তুলিয়া আনিয়াছেন। ছবিগুলি সে দেশের লোকের অজ্ঞাতসারে তোলা হইয়াছিল,নচেৎ তাহারা বিপদ্ ঘটাইত। তিনি লণ্ডনে ফিরিবার পর সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রাসাদে আহ্বান করেন এবং তিনিও তাঁহার ভ্রমণ-যাত্রার সমস্ত বিবরণ দেন। এই নারী একটী অসমসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া নারীজাতির অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[১]

৪। কর্ম্মক্ষেত্রে নারীজাতি।—আজকাল অনেক দেশেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের নানাবিধ কর্ম্মক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। মিসেস্ লিলিগর্ডন নামে এক মার্কিন মহিলা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মেন-প্রদেশে মেন-নদীতে ডুবুরীর কাজ করেন। অন্যান্য ডুবরীদিগের অপেক্ষা তাঁহার সাহস ও নৈপুণ্য কিছুমাত্র কম নহে। ঐ রাজ্যের উটা-প্রদেশে মিস্ ক্লেয়ার কার্ণ্ডমন কেরাণীপদ ছাড়িয়া ডেপুটি শেরিফের (সহকারী দণ্ডনায়ক) কাজ করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাকে ফাঁসি দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়, ডাকাত ধরিবার জন্য তাহাদের আবাসস্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং এইরূপ অনেক নারীস্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়। মণ্টোনার এক সুন্দরী রমণী মিস্ টাইলার ঘোড়-দৌড়ে

সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অরিগন্ প্রদেশে রোজ সার্জ্জন নামে এক রূপসী বালিকা প্রত্যহ একটা অতিশয় বন্য ও নির্জ্জন স্থানের ভিতর দিয়া মাল গাড়ী চালাইয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলনীতে এক দল সন্ন্যাসিনী আছেন। তাঁহারা মঠের সমস্ত কাজ ত করেনই, তাহা ছাড়া মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হইতে গরুর দুধ দোহা, ঘোড়ার ক্ষুরে 'নাল' বসান, সকল কাজই করিয়া থাকেন। জাপানে নিয়াইগাটা-সহরে পঞ্চাশ হইতে একশত জন স্ত্রীলোক এবং ততগুলি পুরুষ প্রত্যহ সেই বন্দরের জাহাজে কয়লা সরবরাহ করে। সুইডেনের নেসোয় একদল স্ত্রীলোক আছে; সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে তাহাদের মত দমকল চালাইতে দক্ষ ব্যক্তি খুব কমই আছে। স্ত্রীলোক যে শাসনকর্ত্তার কাজও করিতে পারেন, কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিন-রাজ্যের অন্তর্গত নিউজার্সির শাসনকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সেক্রেটারী মিস্ ম্যাগ্নিস ফ্লিল অতিদক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। মিসেস্ এনা ফ্লিন রিকার্ট নামে এক কপর্দকশূন্য বিধবা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া স্বর্ণের সন্ধানে বাহির হয়েন। তিনি এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছয়টা বৃহৎ খনি হইতে প্রভূত আয় করিতেছেন। মিস্ হিল্টন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ ছাড়িয়া দিয়া যেখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়, এমন স্থলে ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে গিয়া এখন তাহার পুরস্কারস্বরূপ একলক্ষ পাউণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন। মিসেস্ এলারজ্ রিভার মার্কিন-দেশে একটি খবরের কাগজের অফিসে খামে ঠিকানা লিখিতেন। তাঁহার মাহিনা ছিল দৈনিক ১ ডলার (প্রায় ৪।০)। টাকা-কড়ির হিসাব-ব্যাপারে তিনি পুরুষ-পণ্ডিতদের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমেরিকার টাকার ব্যাপারে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। মিসেস্ হেটি গ্রীণ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিতেছেন; তাঁহার বয়স ৭০ অতিক্রম করিয়াছে। মিসেস্ রিচার্ড কিংএর পশুশালায় লক্ষ লক্ষ পশু আছে। তিনি তাহার কাজ পরিচালনা করিতেছেন। পশুশালাটি এত বড় যে তাহা ইংলণ্ডের একটি জেলার সমান হইবে।

কি আইন ব্যবসায়, কি বিচারকের কার্য্য, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি দেশ-পরিভ্রমণ সকল বিষয়েই এখন পাশ্চাত্ত্য জগতে নারীশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে। এই জড়বাদিত্বের যুগে নারীজাতির অভ্যুদয়-সম্বন্ধে এই কয়টা সামান্য উদাহরণমাত্র দেওয়া গেল। ইহা ছাড়া আরও অনেক দিকে অনেক নারী তাঁহাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ও জগৎকে স্তব্ধ করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোকসংবাদ।—এক সময়ে যাঁহাদের অসীম যত্নে ও অযাচিত সাহায্যে বামাবোধিনীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে নাই, সেই সকল দেবোপম-চরিত্র পরোপকারী নারীহিতৈষী

প্রাচীন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ একে একে ইহলোক হইতে অপসারিত হইতেছেন।

বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিরোধানের পর যাঁহারা বামাবোধিনীর সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন, সিটী স্কুলের ভূতপূর্ব্বশিক্ষক ৺সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি কিছুকাল নিজের শত কার্য্যের মধ্যেও নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণ যত্নে ইহার সম্পাদনকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর এই পরম হিতকারী বন্ধু গত ২৫ আষাঢ় (৯ই জুলাই) বেলা ১২টার সময় তাহর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোধানে আমরা যারপরনাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুত্থানে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সময় সূর্য্যবাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহাতে যোগদান করেন এবং সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ইঁহার

৺সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের গণ্যমান্য কৃতি-সন্তানরূপে বিদ্যমান আছেন। দেশের বহু হিতকর কার্য্যের সহিত ইঁহার যোগ ছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার চির-উন্নতি ও শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার-পরিজনের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

নকল মুক্তা।—জাপানে একপ্রকার নকল মুক্তার আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক আসল মুক্তার মত। সুদক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ইহা নকল বলিয়া ধরিতে পারে না। এই মুক্তা মুক্তার বাজারে ঘোর আন্দোলন আনয়ন করিয়াছে।

উষ্ণ-প্রবাহ।—যুক্তরাজ্যে এই বৎসর অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেক বড় বড় সহরে গরীব লোকেরা সমুদ্রোপকূলে অথবা উদ্যানে শুইয়া রাত কাটাইতেছে। অত্যধিক গরমে অনেক লোক পাগল হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া অথবা ঘুমাইতে

গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় ইউরোপেও অনেক স্থানে গরমে লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লণ্ডনে আগুন লাগিয়া অনেক ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ অবস্থা ; ইহার উপর আবার জলকষ্ট। জল না হওয়ায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক স্থানে এক বালতি জলের মূল্য নয় আনার অধিক হইয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহার ফলে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেলজিয়মেও অগ্নিকাণ্ড। বারুদের গুদামে আগুন লাগিয়া বিপদ্ ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই জলাভাব। যাহাতে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়, সে-জন্য লোকে আকাশে হাউই ছুড়িতেছে।

ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।—উপাদানের অভাব-বশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ স্বতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসার এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র, সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপি ত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ-সংগ্রহও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ-সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন গবেষণাকারিগণ সেই সুবিধার সম্যক্ সদ্ব্যবহারের ক্রটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে-সরকারী লাইব্রেরীর শুভ অনুষ্ঠানের ফল-প্রসূত। যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির-গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদিস্থান। এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, যাহাদের নিকট এইরূপ অমূল্য পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূর-পরাহত। যদি কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের, হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এইরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি পত্র লিখিয়া ডক্টর্ এস এ খাঁ, এম্ এ, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক-মহাশয়কে জানাইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। তিনি মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত। যদি কেহ উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা যাইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 697. September, 1921.

"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৬৯৭ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২৮। সেপ্টেম্বর, ১৯২১।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষপ্রবেশ।

যে অনাদি অনন্ত মহিমময় অসীমশক্তি মহাপুরুষ অহর্নিশ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের মধ্য দিয়া আপনাকে আপনিই প্রকাশিত করিতেছেন, জগতের ক্ষীণ ও মহতী প্রত্যেক শক্তি স্ব স্ব অভিব্যক্তির দ্বারা যাঁহারই মঙ্গলময়ী লীলা পরিব্যক্ত করিতেছে, যে অসীমের অসীম লীলার অপূর্ব্ব বিকাশস্থল হইয়া অনন্ত ভুবনের প্রত্যেক অণু-রেণু পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে, যাঁহার স্পর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত কোটী জীব অভ্যুদিত হইয়া অপূর্ব্ব ছন্দে অনির্বচনীয় গতি-ভঙ্গিতে যাঁহার মহা আরতিতে প্রবৃত্ত থাকিয়া যাঁহারই মধ্যে লয় পাইতেছে, সেই দেবাদিদেব, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতিকে স্মরণ করিয়া বিগত অষ্টপঞ্চাশদ বর্ষে স্বকীয় জীবনে তাঁহারই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকট দেখিয়া বামাবোধিনী আজ তাহার ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষে প্রবেশ করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস একবার পর্য্যালোচনা করিলে, ব্যক্তিগত উন্নতি-অবনতির কথা পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, এই জগৎ এক মহা উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে—এক মহা মঙ্গলের ক্রোড়ে লালিত হইতেছে! অষ্টপঞ্চাশদ বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশের নারীগণের অবস্থার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, এই সত্য কিয়ৎ-পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। আজ এ দেশে প্রত্যেক হৃদয়ে হৃদয়ে যে জাগরণের নিদর্শন দিনে দিনে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্ফুট বা অস্ফুট, অনুকূল বা প্রতিকূল বহুশক্তির একনিষ্ঠ প্রযত্নের ফল। নারীহিত-সাধনায় বহু শক্তি সাপেক্ষ- অথবা নিরপেক্ষ-ভাবে জন্মলাভ করিয়া প্রভূত কার্য্য করিতেছে, দেখিয়া বামাবোধিনী আজ যার পর নাই আনন্দ লাভ করিতেছে। অর্দ্ধশতাব্দীরও

প্রাক্কালে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিতে যে উদ্দেশ্য-সাধনে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা একাকী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আজ সে-উদ্দেশ্য বহুভাবে বহু বিভিন্ন প্রযত্নের দ্বারা সংসাধিত হইতে চলিয়াছে। এই ব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টির মধ্যে বামাবোধিনী তাহারও অবস্থিতি দেখিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছে। জাগতিক বস্তুমাত্রই নশ্বর; বামাবোধিনীও তাদৃশী নশ্বর-প্রকৃতি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। আজিও ইহা এ জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ইহার সত্তাও হয়ত উপলব্ধ হইবে না। কিন্তু যে অবিনাশি-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহা চিরকালই বিদ্যমান থাকিয়া ইহার ন্যায় অপরাপর শক্তিকে অনন্তকাল উৎপন্ন করিবে। এইরূপে বিনাশশীল হইলেও এই শক্তি উৎপত্তিধর্ম্মা ও অবিনাশশীল-শক্তির ক্রোড়ে শায়িত।

আজ নববর্ষে প্রবেশের মুহূর্ত্তে বামাবোধিনী ইহার জন্মদাতা এবং যে-সকল ইহলোকস্থ বা পরলোকস্থ মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইহার প্রাণ-বায়ুস্বরূপ হইয়া নানাপ্রকারে ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করিতেছে; এবং ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, ও সেবক-সেবিকা সকলের শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া এবং সকলের মস্তকে ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নববর্ষে প্রবেশ করিতেছে। বিধাতা তাঁহা হইতে প্রসূতা, তাঁহার দ্বারা সঞ্জীবিতা, এই পত্রিকার দ্বারা তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন্।

ওঁ "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিনা।"
ওঁ স্বস্তি। ওঁ।

নববর্ষে।

(কালেংড়া)

১। নতুন করে'
ফোটাতে হবে
প্রাণের কমল
নবীন প্রাতে!—

নতুন করে
মেলাতে হবে
প্রাণের সেতার
বিশ্ব-সাথে!

২। নতুন করে
পাত্‌তে হবে
তাঁরি আসন
হৃদয়-তলে!—

নতুন করে'
ডাক্‌তে হবে
চরণ ধরে
নয়ন-জলে!

৩। নতুন করে'
আন্‌তে হবে
হৃদয়-মনে
নবোৎসাহ ;—
নব আশায়
ভালবাসায়
ভর্‌তে হবে
সকল গেহ।

৪। নতুন করে'
তাঁর চরণে
লুটিয়ে দিতে
হবে জীবন ;—
সকল দুঃখ
বরণ করে'
ধর্‌তে হবে
তাঁরি চরণ॥

শ্রীনিৰ্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

"শিশুশিক্ষার" পথপ্রদর্শক।

'শৈশব-শিক্ষা' বঙ্গের অনেক শিশুজননীর নিকট হয় ত একটা অর্থহীন কথা বলিয়া প্রতীত হইবে। শিশুকালে আবার শিক্ষার স্থান কোথায়? 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে লালন করিবে। এই সময়ে শিশু নিজের শরীরের যত্ন নিজে লইতে পারে না, নিজের আহার-বিহার নিজে করিতে পারে না, নিজের বেশভূষায় নিজে সজ্জিত হইতে জানে না; নিজের খেলাধূলা লইয়াই সে নিজে ব্যস্ত থাকে। এ-সময় আবার কিরূপে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে? শিশুকেও শিক্ষা-প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সভ্যদেশে শিশুর বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিলে যে আশাতীত ফললাভ করা যাইতে পারে,—ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত! তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন, ইহা অবাস্তব মানস-পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ বঙ্গদেশে শিশুর প্রথম পাঁচ বৎসর এক প্রকার মাঠে মারা যায় বলিলেই হয়। এই সময়ে না লওয়া হয় তাহার শরীরের যত্ন, না লওয়া হয় তাহার মনের যত্ন। উপযুক্ত এবং নিয়মিত খাদ্য ও ব্যায়ামের অভাবে যেরূপ তাহার শরীরের ক্রম-পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষার প্রথম সোপান-প্রণালীবদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের অভাবে ও সেইরূপ তাহার মনোবৃত্তি-বিকাশের সুযোগ বিনষ্ট হয়। অবশ্য আমাদের দেশে শিশুজনোচিত নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের প্রচলন আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে না আছে কোনও ব্যবস্থা, না আছে কোনও প্রণালী। আমরা জানি না যে, সে-গুলির সাহায্যে অতিসহজে ও অতিসরলভাবে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, উদ্ভাবন-শক্তি, এবং কল্পনা ও বিচার-শক্তির উন্মেষ সাধিত হইতে পারে। আমরা জানি না, সেগুলির সাহায্যে কিরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার, সাহস, সাহচর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতির বর্ত্তমান শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা "শিশুর শিক্ষা" বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন্। ঋষি-তুল্য ফ্রোবলের "কুমার-কানন"-(Kinder-garten) শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর শিক্ষারাজ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে,—ইহা সকলেই বিদিত আছেন। সম্প্রতি ইটালীয় বিদুষী রমণী ডাক্তার মণ্টেসেরী তাঁহার 'কুমার-আলয়ে' (Children's home) শিশুশিক্ষার এক নব-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়া 'কুমার কানন'-শিক্ষা-পদ্ধতিকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদেরও পূর্ব্বে যে মহাত্মা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন, আজ সংক্ষেপে তাঁহার কথাই বলিব।

আদি শিশু-বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও শিশু-শিক্ষার পথ-প্রদর্শক ওবারলিন্ মধ্য-ইউ-রোপের ষ্ট্রাস্‌বর্গ-নামক সহরে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং তাঁহাদের সদুপদেশ ও সুশিক্ষার প্রভাবে বাল্যকালেই ওবারলিনের হৃদয়ে কোমলবৃত্তি-সমূহ বিকশিত হইয়া উঠে। বিপন্নের দুঃখ-মোচন, নিঃস্ব জনের সহায়তা-সম্পাদন এবং সমপাঠীদিগের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শন করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাঁহার পরদুঃখ-কাতর কুসুমকোমল হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অপরদিকে কোনরূপ পাপাচরণ সন্দর্শন করিলে তাঁহার পাপদ্বেষী বজ্রকঠিন হৃদয় পাপবিনাশনে, অত্যাচার-নিবারণে, নিগ্রহদমনে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিত। তাঁহার মাতা পুত্রের চরিত্র-গঠনের জন্য বাল্যকালে সযত্নে যে বীজ রোপণ করেন, ভবিষ্যৎকালে তাহাই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক মহীরূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য নিঃসহায় নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল।

শিক্ষা-সমাপন করিয়া ওবারলিন পিতার ইচ্ছাক্রমে ধর্ম্মযাজকের পবিত্র জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি যে-স্থানে পেষ্টর বা ধর্ম্ম-যাজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সে-স্থানটি জ্ঞানালোক-বঞ্চিত কতিপয় গৃহস্থের আবাস-ভূমি ছিল। একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশে এই গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসি-বৃন্দ সাধারণতঃ কৃষিজীবী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পরিপূর্ণ নগরের বিলাস-দ্রব্য তাহাদের নয়নপথে কখনও পতিত হয় নাই। তাহারা জীবনধারণোপযোগী সামান্য আহারে পরি-তুষ্ট, নিরীহ ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু শিক্ষাভাবে তাহাদের হৃদয় অপ্রশস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

স্থানটি ষ্ট্রাসবার্গ-নগর হইতে একদিনের পথ। যাতায়াতের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, নগরের সঙ্গে কোনরূপ সংস্রবও ছিল না। কাজেই শিক্ষার অবস্থা এখানে অতীব শোচ-নীয় ছিল। এই গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল। পাঠশালার সেই অপ্রশস্তগৃহে শিশুগণ আবদ্ধ হইয়া থাকিত। তাহাদের পাঠোপ-যোগী পুস্তক ছিল না, অথবা উপযুক্ত শিক্ষকও ছিল না।

ওবারলিনের পূর্ব্বে ষ্টাউবার এই স্থানের

পেষ্টর ছিলেন। তিনি একদিন সেই পাঠশালায় যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন,—'তোমাদের গুরুমহাশয় কোথায়?' ছাত্র গৃহকোণে শায়িত এক বৃদ্ধ লোককে দেখাইয়া দিল। ষ্টাউবার (Stouber) তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনি ছাত্রদিগকে কি পড়ান?' সে বলিল, 'কিছুই না, কিছুই না। এ কিরূপ কথা!—আমি নিজে কিছুই জানি না; আমি আবার কি পড়াইব?' তখন ষ্টাউবার বলিলেন, 'তবে আপনাকে গুরুপদে নিয়োগ করা হইল কেন?'

সেই বৃদ্ধ উত্তর করিল, 'মহাশয়, আমি অনেক বৎসর এ-স্থানের শূকর-রক্ষক ছিলাম। যখন জরাবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সে-কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযুক্ত হইলাম, তখন আমাকে এই শিশুদের ভারগ্রহণ করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।'

শিক্ষার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ষ্টাউবার মর্ম্মাহত হইলেন, এবং এই দুর্দ্দশা-মোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবসায় সাধারণের চক্ষে এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্কুল-মাষ্টার (School-master) নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তিনি এক নূতন আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহারা রিজেণ্ট (Regent) নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন, এবং দলে দলে লোক আসিয়া সেই Regent বা শাস্তার পদের প্রার্থী হইল। তিনি গ্রামস্থ লোকদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য বর্ণমালা ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। সেই রক্ষণশীল-জনসমাজ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই নব-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে তাহাদের সেই মোহ অপগত হইল এবং লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা বাইবেল (Bible) পড়িতে সমর্থ হইল। এইরূপে ষ্টাউবার তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার কথঞ্চিৎ দূর করিলেন।

ওবারলিন আসিয়া ষ্টাউবারের আরব্ধ-কার্য্যের পরিসমাপ্তি ও পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, অক্ষম বৃদ্ধদের হস্তে শিক্ষার ভার থাকিলে কোনরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না। তাই তিনি এক যুবকদল গঠিত করিলেন এবং শিক্ষাদানপ্রণালী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা-কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই উৎসাহী যুবকদল শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষ ও প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল। যে-সকল অজ্ঞান মূঢ় লোক প্রথমে এই নূতন সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন নানাপ্রকারে এই অশেষ-কল্যাণকর বিধানের সহায়তা-সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বালকদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইলে সূক্ষ্মদর্শী ওবার্লিনের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বাল্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, শিশুগণের শৈশবোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার প্রতি মাতাপিতার কোনরূপ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ দিবাভাগে তাঁহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কাজেই এই সকল শিশুগণের ভার কোনও বৃদ্ধ অক্ষম

স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হইত। সেই বৃদ্ধাগণ নিজ নিজ অজ্ঞানতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত শিশুদিগের উপযুক্তরূপে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিত না।

ওবারলিনের ধ্রুব-বিশ্বাস ছিল যে, মাতৃ-ক্রোড় হইতে শিশুগণের শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবকালে শিশুগণ অনুকরণ-বৃত্তির প্রভাবে ও ক্রীড়া-কৌতুকেরমধ্য দিয়া ভাল-মন্দ, ক্রোধ-ক্ষমা, পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং এই শৈশব অবস্থায় তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ে মাতাপিতা অমনোযোগী হইলে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। এই দোষ অবধারণে তিনি যে-মুহুর্ত্তে সমর্থ হইলেন, অমনি কর্ম্মপ্রিয়, সমাজসেবী, ওবারলিন শিশু-বিদ্যালয়-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী প্রাপ্তবয়স্কা কোমল-প্রকৃতি কতিপয় মহিলা সংগ্রহ করিলেন এবং শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর উপযোগী শিক্ষা তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। ওবারলিন কতিপয় শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিশুদিগের শিক্ষার ভার এই শিক্ষয়িত্রীদিগের (mistress) হস্তে অর্পণ করিলেন। শিক্ষয়িত্রীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। কাজেই প্রথমতঃ সপ্তাহে মাত্র একদিন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে লাগিল। অন্য ছয় দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উক্ত মহিলাগণকে অন্যান্য কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু ওবারলিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অবিশ্রান্ত উদ্যোগে শীঘ্রই অর্থাভাব বিদূরিত হইল এবং শিক্ষাকার্য্য পরিচালনে উন্নতি সাধিত হইল।

শিক্ষয়িত্রীগণ পূর্ব্বেই শৈশবশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে নানাপ্রকার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিশুবিদ্যালয়ে তাঁহাদের শিক্ষাপ্রসূত অভিজ্ঞতার প্রভাবে ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়া অলক্ষিতভাবে শিশুদিগের মানসিক উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াশীলতা ও চঞ্চলতা শিশুদিগের সহজ ধর্ম্ম। তাহারা একটা কাজ ভিন্ন ক্ষণকালও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যখন তাহারা কোনরূপ ভাল কাজ দেখিতে পায় না, তখনই তাহারা নানাপ্রকার অকাজ করিয়া গৃহ বা বিদ্যালয়ের উৎপাত বর্দ্ধন করে। এইরূপ অকার্য্য-স্পৃহা দমন করিয়া, মঙ্গলজনক কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং সেই কাজের ভিতরে যাহাতে স্বভাবতঃ আমোদ-প্রিয় শিশুগণ একটু বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাই সূক্ষ্মদর্শী ওবার্লিন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক শিশুদিগকে মেষলোম ও তুলা-বুনন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; আর কোমল-বয়স্ক বালিকাগণ সূতাকাটা, সেলাই ও বুনন-কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা একেবারে ছোট ও এ-সকল কার্য্যে অক্ষম ছিল, তাহারা বসিয়া বসিয়া বড় ভাইবোনদের এ-সকল কার্য্য দর্শন করিয়া আমোদ অনুভব করিত। কারণ, যে-সকল শিশু কাজ করিতে পারে না, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শিশুর কাজ দেখিতে ভালবাসে। শিশুগণ যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তখন শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদের নিকট বাইবেল বা

অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের নানাপ্রকার গল্প বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কখনও কখনও বা তাঁহারা প্রাণিজগৎ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোহর গল্প করিয়া শিশুদের তৃপ্তি সাধন করিতেন।

যে-শিক্ষার পাশব প্রবৃত্তিসমূহ সংযত ও ও বশীভূত করিয়া শিশুচরিত্রে সত্যপ্রিয়তা, দয়াশীলতা এবং শান্তিপ্রিয়তা বিকশিত করিয়া তুলে, যে-শিক্ষা পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণা ও অপার মহিমার উজ্জ্বল চিত্র শিশুদিগের সমক্ষে উপস্থিত করে, যে-শিক্ষা দৃষ্টজগতের সৌন্দর্য্য-সজ্জা ও বিশ্বের মহা মিলন-মহিমা প্রকাশিত করে, সেইরূপ শিক্ষা যাহাতে অলক্ষিতভাবে শিশুচরিত্রে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ওবার্লিনের শিশুবিদ্যালয়ে তাহার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা হইত।

শিক্ষয়িত্রী শিশুদিগকে ধর্ম্মসঙ্গীত স্তোত্র-পাঠ, ভূগোল ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের (Botany) স্থূল স্থূল বিবরণ শিক্ষা দিতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাক্যালাপে বিনয় ও নম্রতা এবং ভক্তিপরায়ণতার অভ্যাস গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ যত্ন লওয়া হইত। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, বিশেষতঃ কুসুম-রাজির মনোহর সৌন্দর্য্য যাহাতে শিশুমন আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের প্রকৃতিকে কোমল ও মধুময় করিয়া তুলে, এবং যাহাতে কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সৌন্দর্য্য-বোধ দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, শিক্ষাপ্রদানকালে শিশুবিদ্যালয়ে সে-বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

ছয়-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক গুণের বিকাশোপযোগী এইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তাঁহাদের শিক্ষাদান-প্রণালী এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, শিশুগণ কখনও কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিত না। সপ্তবর্ষ বয়সে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য পাঠশালায় প্রবেশ করিত। এই বাল্য-জীবনে তাহারা শিশুবিদ্যালয়ে সুশিক্ষার মধুময় ফল উপভোগ করিত। অনায়াসে তাহারা তখন তাহাদের বাল্যকালোপযোগী শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইত। পূর্ব্বসঞ্চিত শিক্ষানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিত। ধর্ম্মভাব ও নৈতিক জীবনের যে বীজ শিশুবিদ্যালয়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এখন অঙ্কুরিত হইয়া সুশোভন ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদান করিত।

ওবারলিন নিজে এই সকল শিশুবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন অন্যান্য সকল ছাত্রকে ডাকিয়া আনিয়া নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র করিতেন এবং তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তোত্র-পাঠ শ্রবণ করিতেন এবং ধর্ম্মবিষয়ক নূতন উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার স্বর এত কোমল, চিত্তাকর্ষক ও স্নেহপূর্ণ ছিল যে, তাঁহার উপদেশ-বাক্যগুলি সকলে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিত। শিশুগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা ওবারলিনের উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য ছয়দিন পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত এবং সপ্তম দিনে তাঁহার সহাস্যবদন-নিঃসৃত কথামৃত সাদরে ও পরম-পরিতোষ-সহকারে পান করিত।

ওবারলিন শিশুদিগের ব্যবহারের জন্ত তাহাদের পাঠোপযোগী মনোহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার প্রতিবিদ্যালয়ে স্থাপন করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে একটি সম্পূর্ণ নূতন মৌলিক চিন্তা উপস্থিত হইল। যদিও তাহার জীবিতকালে সকল স্থানে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড দেশ পরে তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া শিক্ষা-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তিনি ভ্রমণশীল পাঠাগার ইউরোপে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক একটি পুস্তকাধারে তিন মাস পর্য্যন্ত এক গ্রামে থাকিত। সেই গ্রামের সমস্ত লোক সেই তিন মাস উক্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিত। তিন মাসের অন্তে সেই পুস্তকাধার অন্ত এক গ্রামে স্থাপন করা হইত। এইরূপে সমস্ত গ্রামে তিন তিন মাস অন্তর এই পুস্তকাধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আর গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির ও আনন্দ-লাভের এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া ওবারলিনকে ধন্ত ধন্ত করিতেন।

ইহা প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে জর্ম্মণ-রাজ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সে-সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ-মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে য়ুরোপে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে সত্যের প্রচারকল্পে উক্ত মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কারক প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ য়ুরোপে শিশুশিক্ষা-বিষয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সেই সত্যটি এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের অপূর্ণ ও অঙ্গহীন শিক্ষারই পরিচায়ক! য়ুরোপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া আমেরিকা ও জাপান এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষারাজ্যে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে! আর আমরা বর্ত্তমান অন্ধ ভারতবাসী প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার কাল্পনিক গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

'আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি',
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী
বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত।

সাফল্য।

জীবনের হাসি খেলা প্রতি পলে পলে
মিশে যায় অতীতের অজানিত দেশে,
শত আশা জেগে উঠে মরমের তলে,
তখনি ঝরিয়া পড়ে শোভা-হারা বেশে।

ফুটিতে ফুটিতে অশ্রু শুকাইয়া যায়,
হাসিটিও চাপা থাকে অধরের কোণে,
বলিবার কথাগুলি মনেই মিলায়,—
জীবন ঢলিয়া পড়ে মরণ-শয়নে!

না ফুরাতে দিবসের ছোট কাজগুলি,
রজনী আসিয়া করে প্রভাব বিস্তার,
প্রতিনিমেষের সাথে দূরে যায় চলি
হৃদয়ের আশাভরা স্বপন-সম্ভার।

আমি জানি সফলতা মনোরম সাজে
জেগে থাকে জীবনের ব্যর্থতার মাঝে।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের একটা বিশেষত্ব এই যে, সে-সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নারীজাতির প্রতিপত্তিটা কিছু বেশীমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপন্যাস লিখিতে-ছিলেন জর্জ্জইলিয়ট, মেরি মিট্‌ফোর্ড প্রভৃতি আর গীতি-কবিতায় আপনা হারাইতেছিলেন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রিশ্চিয়ানা রসেটি ইত্যাদি। উজ্জ্বল তেজস্বী ছোট মেয়েটী; চোখের তারা-দু'টী বেশ নীল; গোল মুখের চারিপাশ হইতে কালো চকচকে চুল আসিয়া পড়িয়াছে;—মুখে একটু চিরস্থায়ী প্রভা, চাহনিতে একটু স্বতঃপ্রস্ফুটিত বিস্ময়ের চিহ্ন। সেই মেয়েটীর নাম ছিল এলিজাবেথ ব্যারেট, মোল্টন ব্যারেট, অথবা শুধু 'বা'।

লণ্ডনের নিকটস্থ এক পল্লিগ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারেটের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এড্‌ওয়ার্ড ব্যারেট এক পাহাড়ে জায়গায় গিয়া বাস আরম্ভ করেন; সেখানেই এলিজাবেথের শৈশব কাটে। তাঁহার ৮ ভাই আর ৩ বোনের মধ্যে যে কয়জন বাঁচিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলের চেয়ে বড়। তা ছাড়া তিনি পিতারও খুব প্রিয় ছিলেন; কেন না, এড্‌ওয়ার্ডের মত খিটখিটে মেজাজের লোক সাধারণতঃ পুত্র-কন্যার গৌরবে নিজের গৌরব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। এলিজাবেথের যখন আট বৎসরেরও কম বয়স, তখন হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া তিনি খুব ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ গ্রীক পুরাণকে। গ্রীকদের তিনি একরকম দেবতা বলিয়া কল্পনা করিতেন। তাঁহার একটা বাগান ছিল, সে বাগান তিনি ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টরের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে বাগানে হেক্টরের আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন।

১৫ বৎসর বয়সেই ব্যারেট্‌ রোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার সাথী ছিল কেবল বই আর চিন্তা। ২০ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার লেখা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর পরে তাঁহারা পল্লীবাস উঠাইয়া লণ্ডনে গেলেন। এখানে বিখ্যাত কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ ও ল্যাণ্ডর এবং প্রসিদ্ধ লেখিকা মিস্‌ মিটফোর্ড এবং হিতৈষী-বন্ধু কেনিয়নের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিন বৎসর মাত্র লণ্ডনে বাস করায় পরই তাঁহার

স্বাস্থ্য এরূপ অবস্থায় পৌছিল যে, তাঁহাকে সেই আগামী শীতকালটা কোন বন্দরে গিয়া কাটাইতে হইবে, এইরূপ ঠিক হইল। তখন তাঁহার ছোট ভাই এড্‌ওয়ার্ড দিদির কান্নায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল ও এলিজাবেথের সঙ্গে বন্দরে বাস করিতে গেল। সেখানে গিয়া এলিজাবেথ নড়িতে চড়িতে পারিতেন না; কোন ক্রমে বিছানা হইতে সোফা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের বল কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কিছুকাল পরে এড্‌ওয়ার্ড নৌকায় বাচ খেলিতে গিয়া ডুবিয়া মারা যায়; তাহাতে এলিজাবেথের প্রাণে অতিগুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার জন্যই এড্‌ওয়ার্ড সেখানে গিয়াছিল; সুতরাং তাহার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।—এই ভাব প্রায়ই তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। তাহাতে শরীর আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং এক বৎসর পরে তবে তাঁহাকে কোনরূপে বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

এদিকে তাঁহার কবিত্বের গৌরব ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। তখনকার খনি ও কারখানাতে বালকদের সহিত অতিকঠোর ব্যবহার করা হয়, জানিতে পারিয়া, তিনি 'শিশু-রোদন-("The cry of the children") নামে একটি কবিতা লেখেন্। তাহাতে সাহিত্য-জগতে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার কবিতাবলী একত্র বাহির করা হইল, তখন স্ত্রী-কবিদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হইতে লাগিলেন। ও-দিকে যখন তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া যাতনায় অধীর হইতেছেন, তখন তাঁহার জীবনে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। বন্ধু কেনিয়নের সহিত হঠাৎ এক দিন এক হোটেলে প্রসিদ্ধ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর পরিচয় হইয়া গেল। কেনিয়ন প্রায়ই রবার্টের কাছে ব্যারেটের কথা বলিতেন এবং ব্রাউনিংকে একখানি ব্যারেটের কবিতার বই উপহার দিয়াছিলেন। রবার্ট সেই কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং কেনিয়নের কথামত ব্যারেটের কবিতার প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লেখেন। তারপর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্রাদি চলিতে লাগিল।

একদিন রবার্টের অনেক অনুনয়-বিনয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হইল। সে-সাক্ষাতে একমাত্র বাধা ছিল, ব্যারেটের ক্ষীণ স্বাস্থ্য। কারণ, ডাক্তার তাঁহাকে একেবারে নির্জ্জন ঘরে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা হওয়ার পরও দু'জনের কাহারও মনের উদ্বেগ ঘুচিল না; কারণ, প্রথমতঃ ডাক্তারের বারণ, দ্বিতীয়তঃ পিতার অমত,—এই দুই প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া ব্যারেট কিরূপে ব্রাউনিংয়ের সহিত বিবাহে সম্মত হইতে পারেন, এই ভাবনা তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দেখা গেল যে, এই নূতন আহ্লাদে ব্যারেটের স্বাস্থ্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে। তখন একদিন তাঁহারা অতিগোপনে তাঁহাদের অভিপ্রেত পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন, এবং পর সপ্তাহে লুকাইয়া ইটালি-যাত্রা করিলেম্। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "পর্ত্তুগীজ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" নামে একখানি পুস্তক বাহির হয়। বইখানি কেবল কতকগুলি উচ্চ প্রেরণাময় প্রেম-কবিতার সমষ্টি; উহার প্রথমেই এমন একটি কবিতা আছে যে, একজন সমালোচক বলেন, তাহা ইংরেজী ভাষায় ঐ

প্রকারের অন্য কোন কবিতার অপেক্ষাই হীন নহে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, 'পর্ত্তুগীজ হইতে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', এ নাম পুস্তকের হইল কেন? ব্রাউনিং আদর করিয়া তাঁহার পত্নীকে "আমার ছোট পর্ত্তুগীজ" বলিয়া ডাকিতেন। তাই স্বামিসোহাগিনী এলিজাবেথ পতিভক্তি দেখাইয়া বইএর ঐরূপ নাম করিয়াছিলেন। এ-দিকে লোকে বুঝিত, হয়ত, কবিতাগুলি যথার্থই পর্ত্তুগীজ হইতে অনুদিত।

যে বৎসর "পর্ত্তুগীজের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়, সেই বৎসর রাজকবি (poet laureate) ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মৃত্যু ঘটে। তখন কোন মাসিক পত্রিকায় নাকি এমন প্রস্তাব হইয়াছিল,—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে অনেক স্ত্রীলোকই সাহিত্যে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, আর রাণী নিজেও স্ত্রীলোক; সুতরাং, এলিজাবেথকে রাজকবি নিযুক্ত করিলে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও গুণের বিচার দুইই হইবে।

১৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা স্বামিস্ত্রীতে সুখে ইটালীতে কাল কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণয়কে আদর্শ প্রণয় বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইটালীতে থাকিতে এলিজাবেথের কয়েকখানি বই বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নাম করিবার মত কেবল "অরোরা লি" (Aurora Leigh)। উহা একখানি পদ্যে রচিত উপন্যাস; তাহার নায়ক হইতেছেন একজন তরুণ সমাজসংস্কারক এবং নায়িকা একজন ভাবপ্রবণ ও উৎসাহশীলা যুবতী। সে-যুবতীটাকে এলিজাবেথেরই ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অরোরা লি লিখাতে এলিজাবেথের গৌরব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এ ছাড়া আরও একখানি বইএর কথাও বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহাতে আমরা কবিহৃদয়ের চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারি। সে বইখানির নাম "ক্যাসা গাইডি উইণ্ডোজ।" তাহাতে লেখিকা অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে ইটালীর মুক্তিলাভের জন্য কতকগুলি কারণ দর্শাইয়াছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে এলিজাবেথের পুরাণ ব্রন্‌কাইটিস্ আবার দেখা দিল; কিন্তু তাহাতে কেহই তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই। ২৮শে তারিখে সকলেই নিজ নিজ কাজ সারিয়া শুইতে গেল, কেবল রোগীকে দেখিবার জন্য বসিয়া থাকিলেন একা ব্রাউনিং। শেষ বিদায়ের জন্য যে শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা কেহই ভাবেন নাই। তবে মরণোন্মুখ বুকের মাঝে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের এক অপূর্ব্ব ফোয়ারা ছুটিতেছিল। সরলা বালিকার মত হাসিমুখে এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের প্রাণে এক অদ্ভুত হিল্লোলের সৃষ্টি করিলেন। মিনিট-কয়েকের মধ্যে আঁধার ঘর আরও গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আসিল। এলিজাবেথ তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষার সেই স্বামীর গায়ের উপর মাথা রাখিলেন। ব্রাউনিং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বোধ হইতেছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "সুন্দর" "সুন্দর" এই বলিয়া অনন্ত সুন্দরের কোলে তিনি আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি সাড়ে চারিটা। ভোরের আলো এ-ধার ও-ধার হইতে উকিঝুকি মারিতেছে। বুঝি তাহারও ব্যাকুলতা শুধু ব্যারেটের প্রতীক্ষায়।

শ্রীকমলকুমার সান্যাল।

প্রেম।

(অনুবাদ)

যে জীবনে প্রেম জাগে নাই কভু,
কহ মোরে তা'র কিবা আছে প্রয়োজন ?

প্রেম হয় যে গো জীবনের আলো,
মনের মন্দিরে তারে কদিও বরণ !

মেঘ।

নীল আকাশের নীলিমা ঢাকিয়া
নবীন জলদ ভাসে ;
শুষ্ক ধরার দগ্ধ হৃদয়ে
আশার বারতা আসে।
বৈশাখে তা'র কঠোর সাধনা
প্রখর অনল জ্বালি,
তুচ্ছ করেছে জীবনে মরণ
তোমারে পাইবে বলি !
ওগো বাঞ্ছিত ! উদিত আকাশে
ধরার ধ্যানের ধন !

সার্থক কর সাধনা তাহার
স্নেহ করি বরিষণ।
কত যে দীর্ঘ বিরহ সহিয়া
মরণে বরণ করি,
চেয়ে আছে পথ, আসিবে গো তুমি
নিখিলের তৃষাহারী !
(তব) মন্দ্র ভাষণে হাসিছে তাহার
শুষ্ক নীরস প্রাণ ;
মিলন-অশ্রু ঢালি কর যত
বিরহের অবসান ॥

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

গানের স্বরলিপি।

পিলুমিশ্র—দাদ্‌রা।

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন মনে জানাজানি—
এই বাতায়নে চেয়ে দেখা
ঐ আকাশ-ভরা উদার বাণী।
সারাটি দিন কতই সুরে
স্বপন আমার বেড়ায় ঘুরে !—
কেই বা জানে ? কা'র কাছে তা
ব্যাকুল গানে দেবো আনি ?

থাকুক আমার একলা তবে
আপন মনে জানাজানি।
এই হৃদয়ের অতল নীরে
সন্ধ্যাতারার পড়ুক ছবি—
নানাক্ষণের ভাবনাগুলি
দিক্ রাঙিয়ে সন্ধ্যারবি।
গভীর রাতে চাঁদের আলো
চাইবে আমায় সেই ত ভালো !—

কি হ'বে আর সবার মাঝে
মনকে নিয়ে টানাটানি ?
আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন মনে জানাজানি ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

[মা জ্ঞা -রসা]
II { জ্ঞা জ্ঞা -সা। সা সা -া I রা -া মা। (পা পা -া)} I
আ মা র্ থা কু ক্ এ ক্ লা ঘ রে ০

। পা পা পপা I { মা পা -া। দা পা -া I মা পা -া।
ঘ রে এই আ প ন্ ম নে ০ জা না ০

। (মা জ্ঞা -া)} I মা জ্ঞা পপা I { পা র্সা -া। র্রা র্সা -া I
জা নি ০ জা নি এই বা তা ০ য় নে ০

I ণা ণা -া। (দা পা -া)} I দা পা পপা I মা পা -া।
চে য়ে ০ দে খা ০ দে খা অই আ কা -শ্

। দা পা -া I মা পা -া। মা জ্ঞা -া II
ভ রা ০ উ দা র্ বা ণী ০

অন্তরা।

II {মা পা -া। দা ণা -া I র্সা র্সা র্রা। ণা র্সা -া I
সা রা ০ টি দি ন্ ক ত হ সু রে ০

I র্জ্ঞর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া। র্রা র্সা -া I ণা ণা -া। দা পা -া I
স্ব প ন আ মা র্ বে ড়া য় রে ০

I {ণা ণা ণা। দা ণা -া I পা -া দা। মা পা -া} I
কে ই বা জা নে ০ কা র্ কা ছে তা ০

I মমা পা -া। দা পা -া I মা পা -া। মা জ্ঞা -া I
ব্যা কু ল্ গা নে ০ দে বো ০ আ নি ০

I {জ্ঞা জ্ঞা -া। সা সা -া I রা -া মা। (পা পা -া)} I
থা কু ক্ আ মা র্ এ কূ লা ত বে ০

I পা পা পপা I মা পা -া। দা পা -া I মা পা -া।
ত বে এই আ প ন্ ম নে ০ জা না ০

। মা জ্ঞা -া II
জা নি ০

সঞ্চারী।

{পপা II পা ধা -া। ধা -ণা । I ধা ধা -ণা। পা ধা। -া I
এই হৃ দ ০ য়ে র্ ০ অ ত ল্ নী রে ০

I পা -ধধা ।। সা সা -া I রা জ্ঞা -রা। সা রা -া I
স ন্ধ্যা ০ তা রা র্ প ড়্ ক্ ছ বি ০

I {পা পা ।। দদা পা -া I মা -জ্ঞা জ্ঞা। রা রা ।} I
না না ০ ক্ষ ণে র্ ভা ব্ না গু লি ০

I সা -া রা। জ্ঞা রা -া I সা -ণণা ।। ধা পা ।} I
দি ক্ রা ঙি য়ে ০ স ন্ধ্যা ০ র বি ০

আভোগ।

১´ ০ ১´ ০
I { রা মা -া । পা ণা । I র্সা র্রা -র্সা । ণা র্সা -া I
গ ভী র্ রা তে ০ চাঁ দে র্ আ লো ০

১´ ০ ১´ ০
I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I ণা -া ণা । দা পা -া } I
চা ই বে আ মা র্ সে ই ত ভা লো ০

১´ ০ ১´ ০
I ণা -া ণা । ণা ণা -া I পা পা -া । মা পা -া I
কি ০ হ বে আ র্ স বা র্ মা ঝে ০

১´ ০ ১´ ০
I মা -া পা । দা পা -া I মা পা -া । মা জ্ঞা -া II [ ] II
ম ন্ কে নি য়ে ০ টা না ০ টা নি ০

গুটীপোকার আবাদ।

এ-দেশে বিদেশীয়দের বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যবসায়ই একেবারে লোপ পাইয়াছে। যে-গুলি এখনও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ও জনসমাজে উৎসাহের অভাবে তাহাদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই একটী যে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইলে ঐ ব্যবসায়াবলম্বী ব্যক্তিদিগের উদরপূরণ ও পরিবার-প্রতিপালনের উপযুক্ত পন্থা হইতে পারে—ইহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমাদের দেশের গুটীপোকার ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধন কিংবা অধিক লোকের প্রয়োজন হয় না। মুর্শিদাবাদের পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ পরিবার সামান্য কিছু মূলধনের সাহায্যে এবং নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা এই ব্যবসায়-পরিচালনা করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছদেনের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই ব্যবসায়-পরিচালনের প্রণালীও কিছু কষ্টকর নহে ; এবং ইহার এই একটা বিশেষ সুবিধা যে, ইহার অধিকাংশ কার্য্যই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ; এবং তাহারই এ-কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক দক্ষতা দেখাইয়া থাকে।—এমন কি ঐ স্থানে পল্লীগ্রামের অনেক বিধবাস্ত্রীলোক কোন

পুরুষ-মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকেও একাই ঐ ব্যবসায়ের কার্য্য করিতেছে।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি গুটীপোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। গুটীপোকার বীজ মুর্শিদাবাদ-অঞ্চলে চলিত কথায়"ছঞ্চ"বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং গুটীপোকাকে "পলু" পোকা ও ঐরূপ ক্রয় করাকে "ছঞ্চ ধরা" বলে। গুটীপোকার বীজ বলিতে,—যে সমস্ত গুটীর ভিতর জীবন্ত পোকা আছে সেইগুলি বুঝায়; এবং ঐরূপ গুটী পরীক্ষা করিবার সহজ উপায় উহা বাজাইয়া লওয়া, অর্থাৎ গুটীগুলি এক একটী করিয়া নাড়াইলে যদি প্রত্যেকটীতে বেশ শব্দ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে :হইবে যে সেগুলির মধ্যে পোকা বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং সেইগুলি প্রকৃত বীজ।

বীজ ক্রয় করিয়া আনিবার দুই চারি দিন পরে গুটী-পোকাগুলি একে একে গুটী কাটিয়া বাহির হয়। তখন ঐ পোকাগুলিকে কতকগুলি বড় বড় ডালার উপর রাখা হয়। ডালাগুলি সচরাচর আমরা যেরূপ ডালা দেখিয়া থাকি, সেরূপ নহে। ডালাগুলি বাঁশ হইতে প্রস্তুত হয়। উহাদের এক একটী দৈর্ঘ্যে চারি পাঁচ হাত ও প্রস্থে প্রায় তিন হাত হইয়া থাকে। ডালাগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাদের উপরে প্রায় প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ কতকগুলি সমকেন্দ্র বৃত্ত নির্ম্মিত থাকে। ঐ ডালার উপর পোকাগুলি ডিম পাড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত ডিমগুলি না ফোঁটে ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ, নিয়মিত উত্তাপের অভাবে কিম্বা তাহার আধিক্যে ডিম ফোঁটার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ডিম হইতে পোকা বাহির হইলে তুত গাছের পাতা খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পোকাগুলিকে খাইতে দেওয়া হয়। উহারা বড় হইলে, আর ঐরূপভাবে পাতা কাটিয়া দিতে হয় না। তখন তাহারা অনায়াসেই অখণ্ড পাতা খাইতে পারে।

এই স্থানে তুত-গাছের কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার। এই অঞ্চলে অনেকে জমিতে প্রচুর-পরিমাণে তুত লাগাইয়া থাকে। এই তুতের আবাদে তাহাদের ধান্য কিংবা অন্যান্য রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। তুত-গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না। ঐ গাছের ডাল লাগাইলে সেই ডাল হইতে কিছুদিনের মধ্যে শিকড় বাহির হয় এবং উপরে কাণ্ডে কচি কচি পল্লব জন্মায়। তুত-গাছ লাগাইতে হইলে প্রথমে জমিতে বেশ চাষ দিয়া মাটি নরম করিতে হয়, এবং বর্ষার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি সরস থাকিতে থাকিতে উহাতে তুতের ডাল পুঁতিতে হয়। ডালগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণে কাটিয়া লওয়া হয় এবং কতকগুলি ডাল একত্র করিয়া এক হাত দেড়হাত অন্তর লাগান হইয়া থাকে। গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র ঝাঁকড় হইয়া উঠে এবং তাহাদের বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে, এক বৎসরে তিন চারি বার ঐগুলি কাটিয়া বিক্রয় করা চলে। এই এক বোঝা তুতের দাম আড়াই টাকা তিন টাকা এবং সময় সময় তাহারও অধিক হইয়া থাকে। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে যদি কোন একটি তুত-গাছকে একাকী বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা কালে প্রায় দুই হস্ত পরিধি-

বিশিষ্ট একটী স্থূল বৃক্ষে পরিণত হয় এবং উহা হইতে দুগ্ধ-দোহনোপযোগী একরূপ সুন্দর পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখন পুনরায় গুটীপোকার কথা বলা যাউক্। গুটীপোকাগুলি ঐরূপ পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলে, তাহারা প্রত্যেকে পূর্ব্বকথিত ডালার উপরে তাহাদের মুখ হইতে লালা বাহির করিয়া এক একটী ডিম্বাকার আবরণ প্রস্তুত করে। এই আবরণগুলি তাহারা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করে যে, তাহারা পরিশেষে উহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহাতে আর কোনরূপ ছিদ্রও থাকেনা। এই ডিম্বাকার আবরণগুলি রেশমীগুটী এবং উহা হইতেই পরে সূতা বাহির করিয়া নানারূপ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এই গুটীপোকা যে শুধু গুটীই উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা নয়। পাত্রবিশেষে রাখিতে পারিলে উহারা বিভিন্ন প্রকার আবরণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমরা একবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিন চারিটী গুটীপোকাকে একটী শরার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি যে, পোকাগুলি উক্ত শরার উপরিভাগ আবৃত করিয়া একটী আসনাকার সুন্দর আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়াছে।

পোকাগুলি ঐরূপে গুটী প্রস্তুত করিলে যে-গুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অন্যগুলিকে রৌদ্রের উত্তাপে রাখিয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। কারণ, ঐরূপ না করিলে কিছুদিনের পর পোকাগুলি গুটী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐরূপ ছিদ্রযুক্ত গুটী হইতে সূতা বাহির করিতে হইলে সূতাগুলি সংযুক্তভাবে বাহির হইয়া আসে না। সুতরাং ঐগুলি কোনই কার্য্যে লাগে না। এই জন্য গুটীগুলি সূতা বাহির করার উপযুক্ত হইলে, সূতা-প্রস্তুতকারী ব্যবসাদারেরা আসিয়া ঐ গুলি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার প্রণালী, তুলা হইতে সূতা বাহির করিবার পদ্ধতি হইতে অন্যরূপ। গুটীগুলি গরম জলে সিক্ত না করিলে, উহা হইতে সূতা বাহির হয় না। একটী বৃহৎ পাত্রে গরম জল রাখিয়া তাহার ভিতর কতকগুলি গুটী ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাত্রটীর পার্শ্বে একটী চক্র থাকে এবং ঐ চক্র এক কিংবা দুই জন লোক ঘুরাইতে থাকে। আর এক ব্যক্তি গরম জলের পাত্রের নিকট থাকিয়া একটী বক্রাকার দণ্ডের সাহায্যে জল-স্থিত গুটী হইতে সূতার আঁশ বাহির করিয়া ঘূর্ণ্যমান চক্রের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া দেয়। চক্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সূতা বাহির হইতে থাকে; এবং ঐ ব্যক্তি দক্ষতার সহিত একটি গুটী নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর অপর গুটী হইতে সূতা বাহির করিয়া পূর্ব্বের সূতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহাতে সূতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে রেশমী সূতা প্রস্তুত হয়। যে সূতা মোটা হয়, তাহা দ্বারা মটকা প্রভৃতি কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যেগুলি বেশ সূক্ষ্ম ও মসৃণ হয় সে-গুলির দ্বারা গরদের কাপড়, রেশমী চাদর প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌখীন বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

এই বিবরণের দ্বারা কিরূপে মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের পল্লিগ্রামে গুটিপোকার আবাদ হয়, এবং কি প্রণালীতে গুটী হইতে সূতা বাহির করা হয়, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু এই ব্যবসায়ের মূলে কাহাদের পরিশ্রম

নিহিত থাকিয়া ইহাকে এখনও সজীব রাখিয়াছে, এবং কাহাদের পরিশ্রম জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়া দেশের উন্নতি-সাধন করিতেছে তাহার কিছু আভাস দেওয়া দরকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ব্যবসায়ের অধিকাংশ কার্য্যই বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকে যে পুরুষমানুষের সময়ের অভাব-হেতু এ-কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকে, তাহা নহে। কতকগুলি কাজ আছে যে-গুলি পুরুষদের যথেষ্ট অবসর থাকিলেও তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ভিন্ন গ্রাম হইতে গুটীপোকার বীজ ক্রয় করিয়া লইয়া আশা, ক্ষেত্র হইতে তুঁত গাছ কাটিয়া আনা প্রভৃতি কায়িক-পরিশ্রমজনক কার্য্য পুরুষেরা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া অতিসূক্ষ্মভাবে তুঁত পাতা কাটিয়া ডিম্ব হইতে সদ্যোবহির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিপোকাকে অতি-সন্তর্পণে খাওয়ান পুরুষদের সহিষ্ণুতায় কুলায় না। এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাহায্য ভিন্ন উপায় নাই। তাহারা দিবারাত্র সতর্ক রহিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পোকাগুলিকে খাওয়ায় এবং সময় মত তাহাদিগকে ঘরে লইয়া যায় এবং বাহির করিয়া আনে। তাহারা যেন পোকাগুলিকে নিজেদের শিশুর মত দেখে। যখন তাহারা এই কাজে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় না যে, তাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা যেন কোন কর্ত্তব্যের জন্য এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই আবাদ-কার্য্যে তাহাদের ব্যস্ততা ও আগ্রহাতিশয্য দেখিলে মনে হয় যে, তাহাদের উৎসাহ ও কার্য্য-প্রবৃত্তি অফুরন্ত; এবং তাহাদিগের উপর যদি ইহা অপেক্ষা কোন গুরু কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। আমরা এইরূপ কর্ম্ম-পরায়ণ নারীজাতিকে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া শুধু যে তাহাদের শক্তির পরিস্ফুটনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছি, তাহা নহে; ইহা-দ্বারা আমরা আমাদের দেশের ও জাতির যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি করিতেছি। বাঙ্গালায় সুদূর পল্লীর নিভৃত স্থানে রহিয়া কতকগুলি অশিক্ষিত স্ত্রীলোক, যাহাদিগকে গৃহকার্য্য ছাড়া অন্য কোনও কার্য্যে যোগ দিবার কখনও অবসর দেওয়া হয় না, তাহারাই যে এইরূপ একটী ব্যবসায়কে আজও সজীব রাখিয়াছে, ইহা কি জনসাধারণের সমক্ষে সমগ্র স্ত্রীজাতির কার্য্য-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না?

স্মৃতি-হারা।

(১১)

এতদিনে মণিমোহনের গৃহের বিষাদ-অন্ধকার অপসৃত হইল। গৃহের একমাত্র আলো যে কোহিনুরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের উভয়ের জীবনও বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই কোহিনুর আজ নিজের দুর্ভাগ্য বিস্মৃত হইয়া আবার সরল-বালিকার

মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল ! সত্যই যেন সে গত জীবনের সুখ-দুঃখ মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিয়া নূতন জীবনে নূতন স্মৃতি লইয়া প্রবেশ করিল !—এ কেবলি নূতনের দেশ। গত দিনের যাহা কিছু,—আজ সব মৃত—সব ধৌত—সব লুপ্ত ! পূর্ব্বস্মৃতির কণাটুকুরও ইহাতে প্রবেশের পথ নাই !

পাছে পুরাতন কোন দৃশ্য কোহিনুরের স্মৃতি-উদ্দীপনায় সাহায্য করে, সেই ভয়ে মণিমোহন আর দেশে না গিয়া স্ত্রীকন্যা লইয়া একেবারে কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিলেন। গৃহস্থালীর দ্রব্য সব নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইলেন। কেবল সরোজা সুশীলের ফটো ও অন্যান্য দুই একটি দ্রব্য লুকাইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সেই গুলি নাড়াচাড়া করিতেন।—হায় ! সুশীল যে তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় !

সুশীলকে তাঁহারা বিবাহে যে আংটি দিয়াছিলেন, তাহার উপরে হীরা বসান ছিল বলিয়া ভিতরদিকে সুশীলের নাম লেখা ছিল। সরোজা যে নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পাইতেন না, সেই নামটুক চক্ষু দিয়া দেখিবার সাধে আংটিটা তাঁহার গহনার বাক্সে রাখিয়ছিলেন। ফটোখানিও সেই খানে থাকিত। এইজন্য সে চাবি তিনি সর্ব্বদা অতিসাবধানে লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু এত সাবধান না হইলেও এখন ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। কারণ, কোহিনুর টাকা-কড়ি বা সোণারূপার বিশেষ কোন ধার ধারিত না। পিতার সহিত বেড়ানো,পাখী-পোষা, ছবি আঁকা, মায়ের সঙ্গে স্নেহের বিবাদ করা, আর ইচ্ছামত ঘর-সংসারের কাজ করা এই তাহার কাজ ছিল। মণিমোহন বলিতেন, "তোমার মা আর ভাল খাবার তৈয়ার করিতে পারেন না, তুমি মা আমার খাবার তৈরী কর তো।" কোহিনুর তাহাতে ভারী খুসী। পিতার আহার্য্য সে নিজে সব প্রস্তুত করিত। সরোজ হাসিয়া বলিতেন, "আঃ আমি বাঁচিয়াছি।"

গভীর রাত্রি। কোহিনুর পার্শ্বের ঘরে ঘুমাইতেছে। মণিমোহন ধীর-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সরোজা !"—স্বামীর শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সরোজা বলিলেন, "কিছু বল্‌বে ?" মণিমোহন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "একটা কথা তোমায় বল্‌বার ছিল।" স্বামীর কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া সরোজা একটু বিস্মিতা হইলেন ; বলিলেন, "আমায় কথা বল্‌বে, তা আবার ভাব্‌চ কি ?" মণিমোহন ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"একটু অপ্রিয় কথা সরোজা ! সরোজা স্বামীর মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন করিল। মণিমোহন বলিতে লাগিলেন—"দেখ সরো, কোহিনুরকে ফিরে পেয়ে আমার মনে একটা নূতন সাধ জেগে উঠেছে ; কোহিনুরের তো পূর্ব্ব-কথা কিছুই মনে নেই ; তবে কেন মা'কে চির-সন্ন্যাসিনী ক'রে রাখি ? আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চ সরোজা ?"

সরোজা সায় দিয়া বলিল,"বুঝেছি; কিন্তু— !"

—"কিন্তু ! কিন্তু কি ? তোমার মত নেই ?" সরোজা স্বামীর বক্ষের ভিতর মুখ লুকাইল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু কোহিনুর যে আমার সুশীলের স্মৃতি। যাকে একদিন তার হাতে চির-জন্মের মত তুলে দিয়েছ, তাকে আজ অপরকে সমর্পণ করবার আমাদের কি অধিকার আছে ? আমার সুশীল যে কোহিনুরের মধ্যেই তার স্মৃতি জড়িয়ে রেখে গেছে। তাকে তুমি একেবারে মুছে ফেল্‌বে ?"

অতিযত্নে স্ত্রীর চক্ষুজল মুছাইতে মুছাইতে মণিমোহন বলিলেন, "সে কি আমিও জানি না? কিন্তু সুনীল যাকে রেখে গিয়েছিল, সে তো তারি কাছে চলে গিয়েছে। এ তো আমার দক্ষ-যজ্ঞের সতী আবার উমা হয়ে এসেছেন। সরোজা, যাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি, নিজের সন্তানের অধিক করে ভালবেসেছি, সে কি ভুলবার জিনিষ! যত-দিন আমরা বাঁচ্‌বো সে সুনীল আমাদের বক্ষ জুড়ে থাক্‌বে। কিন্তু ভেবে দেখ, আমাদের এমন আর কে আছে যে, যদি আজ আমরা দু'জনেই মরি,- আমার কোহিনুরের ভার নিতে পারে? কে বল্‌তে পারে এরূপ ভাবে থাক্‌লে দু'দিন পরে কোহিনুরের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠ্‌বে কি-না? সরোজে, তোমার সেই মর্ম্ম-পীড়িতা কোহিনু-রের স্মৃতি একবার স্মরণ করে দেখ! তুমি কি না হ'য়ে আবার তা'র সেই চিত্র দেখ্‌তে চাও? যদি এই সময় কোহিনুরকে সৎপাত্রস্থ করি, দু' এক বছর যেতে যেতেই সে ছেলে-পিলের মা হয়ে পড়্‌বে, তখন আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করবার তার সুযোগ হবে না, কিংবা মনে তার আভাস এলে সে তাতে আর অভি-ভূত হ'তে পারবে না। আমার কথা বেশ্ করে ভেবে দেখ সরোজা! আমি যতই তার এখন-কার এই আনন্দময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে তার কিছুদিন পূর্ব্বের সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তির তুলনা করি, ততই আমার হৃদয় আশঙ্কায় ভরে ওঠে! আর বেশীদিন হয়ে গেলে, তখন পাত্রস্থ করাও কঠিন হবে।"

"তুমি যা বলেছে তা ঠিক; কিন্তু আমার কোহিনুরের উপযুক্ত পাত্র না দেখে কোন কাজ ক'র না। আমাদের বুদ্ধির দোষে মা'র আমার অদৃষ্টে যেন আবার নূতন করে কষ্ট-ভোগ না হয়! সুনীলকে আমরা কি রত্নই পেয়েছিলাম। হায় রে, আমার কপাল!"

মণিমোহন সরোজার সম্মতি পাইয়া বলিলেন—"সে আর বল্‌তে! আমরা যে হতভাগ্য, তারও কিছুমাত্র ভুল নেই। সরোজা, আজ যে কথা তোমায় বল্‌ছি, ভেবে দেখ, এরও বলবার দিন তো আমাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেই মহাপুরুষের অনুগ্রহ না হলে।"

বাধা দিয়া সরোজা বলিল, "থাক্, আর সে কথা তুলো না। সেদিনের কথা মনে হলে, আমি কেমন হয়ে যাই। যে-দিন গিয়েছে যাক্। তোমার কথাই ঠিক্। আমরা আবার সম্পূর্ণ নুতন জীবনে প্রবেশ করব।"

ইহার পর হইতে মণিমোহন কোহিনুরের বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ফলও অতি শীঘ্রই ফলিল। কোহিনুরের অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও সরলতাপূর্ণ মধুর আচরণে একটী যুবক দিনে দিনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

যুবকটীর নাম বিনোদ। সে ধনবান্ সমাজ-সংস্কার-প্রিয় পিতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার বক্ষই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। অনেক যত্নে অতিসাবধানে বিনোদের পিতা পুত্রকে সুশিক্ষা দান করিয়া-ছিলেন। বিনোদ রূপবান্ তো বটেই, পরন্তু সে-রূপের এমনি একটা মাধুর্য্য ছিল যে, তাহার জন্য শত রূপবানের ভিতরেও তাহারই দিকে লোকের তৃষিত আঁখি বারংবার আকৃষ্ট হইত। পিতা অনেক অর্থ-ব্যয়ে নিজের সতর্ক-দৃষ্টিতে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন, বিনোদের জীবনে তাহা

ব্যর্থ হয় নাই। রূপ ও ঐশ্বর্য্যের সহিত বিনয়-নম্র চরিত্র মণি-কাঞ্চন-যোগ করিয়াছিল।

বিনোদের পিতা কাশ্মীরের উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। বিনোদের শৈশব-কাল সেই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে বিনোদ কলিকাতায় আর্ট স্কুলে শিক্ষা করিতেছিল।

এখানে আসিয়া বিনোদের যে-কয়টি সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অমল-নামক একটী যুবকের সহিত তাহার বন্ধুতা প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল। অমল অতিসচ্চরিত্র যুবক; কোহিনুরের পিতা মণিমোহনের অতিপরিচিত। নূতন চিত্রাদি প্রস্তুত হইলে মণিমোহন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে তাহা দেখাইবার জন্য সে তাহার অবসর-দিনে তাঁহাদিগকে তাহাদের চিত্রশালায় লইয়া যাইত। একদিন চিত্র-প্রদর্শনীতে অমল মণিমোহন ও তাঁহার পত্নী-কন্যাকে লইয়া আসিল। এইস্থানে কোহি-নুরের অপূর্ব্ব রূপরাশি বিনোদের চক্ষে পড়ে।

জগতে রূপ বা যৌবন চারিদিকেই বিস্তৃত আছে, কিন্তু কে কোন্ দিন কাহাতে অকৃষ্ট হয়, কিছুই জানা যায় না। কোহিনুরকে প্রথম দেখিয়াই, জগতে যে সৌন্দর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ তন্ময় হইয়া গেল,—সে আত্মহারা হইয়া পড়িল! সে-দিন গৃহে ফিরিয়া বিনোদ তূলিকা লইয়া কোহিনুরের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু চঞ্চল মন তাহার সে চেষ্টা অনবরত ব্যর্থ করিতে লাগিল। তখন তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, [illegible]র একটীবার কি করিয়া সে মেয়েটীর [illegible] পায়! অতিকষ্টে কয়েকটী দিন অতিবাহিত হইবার পর পুনরায় একদিন ঠিক সেই পূর্ব্বদিনের সেই-সময়ে পত্নীকন্যা-সমভিব্যাহারী মণিমোহনকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিনোদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও বিনোদ এত আনন্দ যেন পায় নাই! যখন মণিমোহন কন্যাকে তাহার নিজ-নির্ব্বাচিত কয়েকখানি অতিমনোহর চিত্র ক্রয় করিয়া দিলেন, তখন সেই চিত্রগুলির মধ্যে বিনোদের স্বহস্তাঙ্কিত দুইখানি চিত্র দেখিয়া বিনোদ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল এবং হর্ষোন্মত্ত হইয়া অপলকনেত্রে সে-দিনও কোহিনুরকে দেখিল। সে তাহাকে যতই দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এরূপটী জগতে আর নাই! মণিমোহনের সবিশেষ পরিচয় এবং বালিকাটি চিত্রবিদ্যা জানে কি না ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাহার নিতান্ত কৌতূহল হইলেও লজ্জাবশতঃ মণি-মোহনের সহিত সে আলাপ করিতে পারিল না বা অমলকেও সেজন্য অনুরোধ করিতে পারিল না। বিনোদ যদি কোহিনুরকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে, বোধ হয়, এই অতিসহজ কার্য্যে তাহার অত কুণ্ঠার আদৌ উদ্রেক হইত না। কারণ, অপরিচিত ভদ্রব্যক্তি প্রত্যেকেই অপরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারে। কিন্তু বিনোদের মনে হইতে লাগিল, মণিমোহনের সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গ হইলেই, তাহার মনের এই নবোচ্ছ্বসিত প্রেমটুকু বুঝি সকলের চক্ষেই ধরা পড়িয়া যাইবে। সে যে অতিনূতন! অতিমধুর! অতিকোমল!! বুকের নিভৃত—নিভৃততম স্থানে অতিগোপনে রক্ষার ধন! লোকের

সকৌতুক চক্ষের সম্মুখে বাহির করিবার সে যে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কিন্তু অধিক দিন বিনোদ মনের ভাব দমন-করিয়া রাখিতে পারিল না। একদিন সে অমল কে তাহার চিত্রক্রেতা মণিমোহনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার-জন্য অনুরোধ করিল। অমল মণিমোহ-নের পরিচয় দিয়া তাঁহার সহিত বিনোদের পরিচয় করাইয়া দিতে সম্মত হইল। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে বিনোদের মনের প্রকৃত ভাবও অমলের চক্ষু এড়াইল না। ঈষৎ হাসিয়া সে গাহিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কবে ধরা পড়ে কে জানে!"

মণিমোহন সুপাত্র খুঁজিতেছিলেন বটে, কিন্তু এমনটি যে পাইবেন, তাহা আশা করেন নাই। একটু বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতার দ্বারা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া তবে বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া, তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে বিনোদকে আসিতে দিতে লাগিলেন। বিনোদের গল্পের ভঙ্গি, হাসির মাধুর্য্য ও অমা-য়িক ব্যবহারে মণিমোহনের ন্যায় সরোজাও ক্রমে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কোহিনুর এ-পর্য্যন্ত কোনও সঙ্গী পায় নাই; সেও ক্রমে নির্ব্বিকারচিত্তে বিনোদকে অনেকখানি ভালবাসা দিয়া ফেলিল। মণিমোহন সেটুকু লক্ষ্য করিয়া কোন কোন দিন বা কোহি-নুরকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"বিনোদের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই না? কেমন সুন্দর ছেলে-টি!" কোহিনুর লজ্জায় লাল হইয়া নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া লইত। মণিমোহন সরোজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেন। এই সময়ে নানাভাবে ও নানাকারণে বিনোদের পিতার সহিত মণিমোহনের বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ্য জন্মিল।

বিনোদের আজ-কাল প্রায়ই মণিমোহনের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাহার পর বিনা নিমন্ত্রণেও বিনোদ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে ঘনিষ্ঠতা আরও একটু গাঢ়তর হইলে বাড়ীর কাহারও সামান্য অসুখ হইলেই ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, সেবা প্রভৃতির ভার নিজে লইয়া বিনোদ সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। এটা যে ঠিক পরোপকার করার জন্য, সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে, সেটা ভাবা যায় না। যে-কোনও ছলে যতটুকু সময়ের জন্যই হউক্, বিনোদের কোহিনুরকে দর্শন করাই উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মণিমোহনের বিচক্ষণ দৃষ্টি বিনোদের এই ব্যাকুল প্রেমটুকু সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছিল।

একদিন সময় বুঝিয়া তিনি বিনোদের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। এ বিষয়ে বিনোদের কতখানি সম্মতি ছিল, তাহাও কি বলিবার! বিনোদ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মণিমোহন বলিলেন, "কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি কোহিনুরকে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানাই নাই; তুমি তাকে আমার সম্মতি জানিয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা কর। সে এখন বড় হইয়াছে, তার মত না পাইলে তো বিবাহ দিতে পারি না।"

বিনোদ সর্ব্বদা এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিলেও, নির্জ্জনে বা গোপনে কোহিনুরের সাক্ষাৎকার-লাভ তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই বা কেহ ঘটায় নাই। এ-বিষয়ে সরোজা ও মণিমোহন অতিসতর্ক ছিলেন। আজ স

মোহনের অনুমতি পাইয়া বিনোদ কম্পিত-চিত্তে কোহিনুরের দর্শন-লাভের আশায় বাটী-সংলগ্ন উদ্যানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু এত আনন্দেও অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিনোদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল ;—কোহিনুর যদি অসম্মতা হয়! বিনোদের এই যে হৃদয়-প্লাবী প্রেম একি একটুও কোহিনুরকে আকর্ষণ করিবে না ? অকৃত্রিম প্রেম চিরদিনই তো প্রণয়ীকে সফলতার সুধাপাত্র দান করিয়া আসিয়াছে ! আজ বিনোদের ভাগ্যেই কি তাহা বিফলতায় পরিণত হইবে! যদি কোহিনুর আজ প্রত্যাখ্যান করে, বিনোদের সে অঘাত কি অসহনীয় হইবে ! সে ভীষণ অঘাত অপেক্ষা চিরদিন ভ্রান্ত আশায় বক্ষ বাঁধিয়া ওই মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জীবন কাটানও ত ভাল। বিনোদ ভাবিতে লাগিল, সে কোহিনুরকে বলিবে কি না বলিবে ? কিন্তু কোহিনুরের হাসি, কথা, ব্যবহার প্রত্যেকটি যতই সে মনে করিতে লাগিল, ততই তাহাতে মধুর ভালবাসার অমিয়নিদর্শন ছাড়া আর তো কিছু বিনোদের চক্ষে পড়িল না। তবে কেন এ মিথ্যা আশঙ্কা ? বিনোদ যাহাকে এত ভালবাসে, সে কেন না ভালবাসিবে ! এ জগৎ ত পবিত্র প্রেমের জগৎ ?

মণিমোহন বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়াছিলেন ; কোহিনুর পিতাকে জল খাওয়াইয়া বাতাস দিতেছিল। মণিমোহন বলিলেন,—"মা, রঘুয়াকে পাখা দাও, বাতাস করবে। তুমি আজ বাগান থেকে একগাছি মালা গেঁথে নিয়ে এস ; তোমায় গাঁথা মালা আমার মা'র ছবিতে পরিয়ে সন্ধ্যাবেলা আরতি করবো।"

কোহিনুর বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিনোদ অদূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে উৎসুক-দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে। কোহিনুরের যদি পুর্ব্বেকার যৌবনোচিত ভাব জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিত, বিনোদ কি খুঁজিতেছে। সরলা তরলহৃদয়া কোহিনুর মধুর হাসিতে দিক্ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন ! কই বাবার কাছে যান্ নি যে ? বাবা যে উপরে বারান্দায় আছেন।"

বিনোদ।—না এখনও যাই নি। আজ বড় গরম, তাই বাগানে ঠাণ্ডায় একটু বেড়াচ্ছি। এই ফুলগুলি কেমন ফুটেছে। চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে—তাই দেখ্ছি।

"ওইগুলিই আমি তুল্‌তে এসেছি।—আচ্ছা, আপনি মালা গাথ্‌তে জানেন ? বাবা আমায় মালা গেঁথে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঠাকুমার ছবিতে পরান হবে। আমি কিন্তু তত ভাল জানি নে।"

বিনোদ সুন্দর মালা গাঁথিতে জানিত ; বলিল, "আচ্ছা, আমি দেখিয়ে দেব। কিন্তু তা হলে শুধু ওই ফুলেই হবে না ; এস, আরও রং বেরংয়ের ফুল তুলে নিই। মালার মধ্যিটিতে লাল ফুলে তোমার নাম লিখে দেব। সে নামটি সত্যই কোহিনুরের মত ঝল্ ঝল্ করবে।"

ফুল তোলা হইলে দুইজনে মালা গাঁথিতে বসিল। বিনোদ বলি বলি করিয়াও বার কয়েক পারিল না ; শেষে অনেক চেষ্টায় নিজের স্পন্দিত হৃদয় একটু সংযত করিয়া ধীর-কোমল-স্বরে ডাকিল— "কোহিনুর !" হাসিয়া কোহিনুর বলিল, "মালা গাথ্‌তে গাথ্‌তে

আপ্নার ঘুম আস্চে না-কি? অমন তন্দ্রার ঘোরের মত কথা কইচেন যে!" "ঘুমের ঘোর? না কোহিনুর, ঘুমের ঘোর নয়।...কোহিনুর, আচ্ছা, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি কি বুঝ্তে পার?"

বিনোদের মুখের উপর নীল ভাসা আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া কোহিনুর বলিল,"পারি নে! আপনি কি বলেন? আমি কি ছেলেমানুষ যে, আমায় কে কত ভালবাসে, তাও আমি জান্তে পারি না?"

"পার! তুমিও কি আমায় ভালবাস?"

"কেন? আপনি কি বুঝতে পারেন না? আপনি তো আমার চেয়েও বড়।"

সাগ্রহে বিনোদ বলিল, "কোহিনুর যদি তোমায় সর্ব্বস্ব দান করে ধন্য হই, তুমি নেবে?"

কোহিনুর বিস্মিতার মত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না। বিনোদ সাগ্রহে আবার বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, আমাকে বিবাহ কর্তে তোমার অমত আছে?"

সেই কোমল কপোলে রক্তরাগ অরুণবিকাশের মত ফুটিয়া উঠিল। যে দুটি অসঙ্কোচে বিনোদের মুখের উপর স্থাপিত ছিল, প্রভাত পদ্মের মত সে চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হইয়া দৃষ্টি ভূমিতে বদ্ধ করিল; ললাটে কুঞ্চিত অলকার নিম্নে মুক্তাবিন্দুর মত দুই একটি ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হস্তখানি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদ অমিমিষে কোহিনুরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কোহিনুরের লজ্জাবনত মুখে কোন কথা ফুটিল না! বিনোদ আবার বলিল—"বল তোমার উত্তরের উপর আমার সব নির্ভর কর্ছে। বল, তোমার কি মত?"

কোহিনুর অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে উত্তর করিল—"যান্, আমি সে কি বল্‌ব।"

"তা হলে তোমার অমত নেই!"

কোহিনুর মৌন থাকিয়া সম্মতি জানাইল।

"তবে আমি বাবাকে জানাই গে"—বলিয়া, মুহূর্ত্তকে বর্ষ জ্ঞান করিতে করিতে কোহিনুরের হস্তে একটি পুষ্প দিয়া হর্ষোন্মত্ত বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কোহিনুর তখন সহাস্যে বলিয়া উঠিল,—"বা বেশ লোক তো! খুব মালা গেঁথে দিলেন যা হোক!" "তুমি ততক্ষণ গাঁথ না, আমি বাবার কাছ থেকে এখনি এসে গেঁথে দিচ্চি—" বলিয়া বিনোদ প্রস্থান করিল।

প্রেম বা দাম্পত্য-জীবনের সফলতা বহু-সাধনার বহু-পুণ্যের দ্বারা প্রাপ্য। দেখা গিয়াছে, যাহাকে দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয়, যাহাকে পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, অনেক সময়ে তাহাকেই বহুকষ্টে বক্ষে ধরিয়া হয় তো মানুষ হতাশভাবে আক্ষেপ করিয়া থাকে। এ-জগতে "প্রেম মরীচিকা-মাত্র।" সমস্ত জীবন ধরিয়া আকুল আকাঙ্ক্ষায় যাহাকে মন চাহিয়া চাহিয়া আসিয়াছে, দেখা গিয়াছে, হয়ত তাহারই মিলন জীবনে দুষ্প্রাপ্য হইয়া জীবনকে মরুভূমি করিয়া দিয়াছে; মন যাহাকে চাহিয়াছে, তাহাকে পায় নাই, কিংবা যাহাকে পাইয়াছে, তাহাকে চাহে নাই! কোথাও বা করাল কাল আসিয়া বাঞ্ছিতকে কাড়িয়া লইয়া সুখের মিলনে দুঃখের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে! ইহাই ত প্রায়ই প্রণয়-রাজ্যের অখণ্ড্য বিধান! কিন্তু যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে সেই প্রণয় ও পরিণীতার মধ্যে সামঞ্জস্য

সাধিত হয়, তাহার জগৎ আর জগৎ থাকে না,—তাহা প্রেমের স্বর্গে পরিণত হয় ! সুখের কল্পতরু-মূলে সে প্রেমিক-যুগলের সার্থক-জীবনতটিনী মন্দাকিনীর পূত-ধারার মত অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বহিয়া যায় ! বিশ্ব তাহাতে স্তম্ভিত, পূত ও বিভূষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

নৈরাশ্যের উপমা।

তার—হৃদয় মধুর প্রণয়ে লিপ্ত,
নয়নে খেলিছে আনন্দ দীপ্ত,
পরাণ সদাই সুখেতে তৃপ্ত,
হর্ষের উর্ম্মিতে আনন ভরা।
মোর—হৃদয় নিয়ত কালিমা-ঢাকা,
আঁখিতে দারুণ বিষাদ আঁকা,
জীবন অনন্ত যাতনা-মাখা,
বিষণ্ণ বদন জীয়স্তে মরা।
তার—হৃদয়ে রোপিত শান্তির মূল,
নিত ফোটে তাতে কতই ফুল,
গুঞ্জরে সেথায় ভ্রমরকুল,
বিহগ-কূজনে ধ্বনিত প্রাণ !

মোর—অন্তর শুধুই অশান্তিময়,
ফোটে নাকো হেথা কুসুমচয়,
মধুপ-গুঞ্জন-ধ্বনি না হয় ;—
নীরব হেথায় কাকলি-তান !
সে যে—প্রণয়-ভিখারী পুষ্প-বালার,
—তেজসিংহ বীর কি রূপ তার,—
সে রূপে ক্ষরিছে জ্যোছনা-ধার,
তার সনে মিলি কেমন ক'রে !
আমি—কালো ভীলবালা পর্ব্বত-বাসী,
উপল-খণ্ড লয়ে খেলি হাসি,
নির্ঝর-ঝর্ঝরে ছুটিয়ে আসি,
গোপন-প্রণয় মরমে ধরে। *

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।

আমাদের খাদ্য।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গম।—ভাতের পরই গম আমাদের দ্বিতীয় খাদ্য। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশ ছাড়া ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহে ও ইউরোপীয় দেশে গমই প্রধান আহার এবং ভাত তথায় অপ্রধান। গমের মধ্যভাগের উপাদান শতকরা ৭৪ ভাগ শ্বেতসার ও চিনি; বীজাণু অংশে কিছু আটাল উপাদান, কিছু শ্বেতসার, চিনি ও খনিজ পদার্থ আছে। গমের ভূষাতে উপরিউক্ত সকল পদার্থই বর্ত্তমান, সেজন্য আটা ময়দা অপেক্ষা পুষ্টিকর। সুজীতে (samalina) মধ্যভাগ ও বীজাণু ভাগের অংশই অধিক থাকে; সেজন্য ইহা অত্যন্ত আটাল।

ময়দা ভিজাইয়া অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া সূতার ন্যায় চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট যে পিষ্টক

* ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবন-সন্ধ্যা'-গ্রন্থের ভাবার্থবলম্বনে লিখিত।

তৈয়ারি হয়, তাহাকে Macaroni, Spaghetti অথবা Varmicelli বলে। ইহাকে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত হয়।

ময়দার রুটির প্রায় পাঁচ ভাগের তিনভাগ পুষ্টিকর উপাদান।

ভুট্টা।—যদিও ভুট্টা বাঙ্গালা-দেশের প্রধান খাদ্য নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপীয় সকল দেশেই ভুট্টা একটি প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য। পুষ্টি-কারিতায় হিসাবে ইহা খনিজ উপাদানে গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এবং তৈলময় উপাদানে ইহা যই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। ভুট্টার তৈলময় অংশ গম কিংবা যবের দ্বিগুণ। এই সকল উপাদানের জন্য ইহা একটা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য। ভুট্টার দানার খোসা ও বীজাণু-অংশ বাদ দিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ ভুট্টার পুষ্টিকারিতা গুণে কোনই প্রভেদ নাই। ভুট্টার আটার অল্প মূল্যের জন্য, ইহা প্রায়ই ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। Corn-flour যাহা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা কেবল ভুট্টার শ্বেতসার অংশ হইতে প্রস্তুত। Hominy ও Flaked maize চূর্ণ ভুট্টার দানা হইতে প্রস্তুত। ইহাতে সুন্দর পিষ্টক প্রস্তুত হয়।

যই।—যই সকল শস্যের মধ্যে অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহাতে আঠাল উপাদান, শ্বেত-সার, তৈলময় উপাদান ও খনিজ পদার্থ সকলই বর্ত্তমান, কিন্তু তৈলময় ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাজারের oat meal যইএর দানা গরম করিয়া পেষণীর মধ্যে চাপিয়া চূর্ণ করিয়া রন্ধনের উপযোগী করিয়া বিক্রীত হয়।

যব।—যবে খনিজ উপাদান অন্যান্য শস্য অপেক্ষা অধিক, এবং গম অপেক্ষা তৈল-পদার্থ ইহাতে অধিক। ইহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার Barley পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে Barley meal চূর্ণ দানা হইতে প্রস্তুত; ইহা আমাদের ব্যাসম-জাতীয়। Scotch Barley খুব মোটা; আটা হইতে প্রস্তুত হয়। Pearl Barley খুব মার্জিত দানা হইতে প্রস্তুত হয়। Malt গাঁজান (fermented) দানা হইতে প্রস্তুত হয়।

আলু।—আলু যদিও আমাদের দেশীয় খাদ্যবস্তু নয়, তথাপি অধুনা ইহা আমাদের একটী অত্যাবশ্যক আহার। ইহাতে শ্বেত-সারের অংশই অধিক। আলুর উপাদান-সমূহ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্নরূপে বিভক্ত। আলুর খোসার নিম্নস্তরে আঠাল অংশ, তৈলময় ও খনিজ উপদান; মধ্যস্থলে শ্বেতসার এবং এই দুইএর মধ্যস্থিত অংশ জল ও খনিজ-পদার্থে পূর্ণ। ইহাকে রুটীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত গুরুপাক ও দ্বিতীয়তঃ শ্বেতসার হিসাবে ইহার আঠাল উপাদান অত্যন্ত কম।

উদ্ভিজ্জ আহারীয়ের রন্ধন-প্রণালী, বিশেষতঃ মূল-জাতীয় উদ্ভিদের রন্ধন-প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা খোসার সহিত সিদ্ধ করাই উচিত; কারণ, খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে ইহার সারাংশ অনেক নষ্ট হয়। নৈনিতাল-জাতীয় পাহাড়ী আলু, যাহার মধ্যাংশ মোমের ন্যায় নরম, তাহা সিদ্ধ করিলে আঠাল হয়। নূতন আলুতে ইহা বিশেষ পরিলক্ষিত

হয়। যে সকল আলুর মধ্যাংশ ময়দার ন্যায়, তাহা সহজ-পাচ্য।

আট সের আলু খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রাখার সময় তাহার সারাংশ যাহা নষ্ট হয়, তাহা প্রায় আধপোয়া মাংসের সমতুল। ইহা পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে।

শাক্‌-সব্‌জি।—পুষ্টিকারিতা-হিসাবে শাক্‌ সব্‌জির মূল্য অত্যন্ত অল্প। কিন্তু কয়েকটী কারণে ইহা আমাদের অত্যাবশ্যক আহার। ইহাতে পাকস্থলীর উত্তেজনাকারক দ্রব্যসমূহ বর্ত্তমান থাকায় ইহা পচন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহাতে খনিজ পদার্থ অধিক-পরিমাণে থাকায় ইহা ক্ষার-ধর্ম্মাক্রান্ত এবং সেজন্য শরীরের অম্লরস ইহা দূর করে। ইহার লৌহ উপাদান শরীরের পক্ষে একটী আবশ্যক আহার। খাদ্যের পচন-সাহায্যকারী বস্তু (vitamin) ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এই সকল উপাদান বর্ত্তমান থাকায় শাক্‌-সব্‌জি আরোগ্য-সাধক ও স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক। ইহাতে তৈল-ভাগ অল্প থাকায়, ইহা মাখন কিংবা তৈল-সংযোগে রন্ধন করা হয়।

কাঁচা কিংবা অসিদ্ধ শাক্‌-সব্‌জি শীঘ্র পরিপাক কিংবা শরীরে শোষিত হয় না। শাক্‌-সব্‌জি খুব টাট্‌কা অবস্থায় আহার করাই উচিত, নচেৎ ইহা শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। কোন কোন শাক্‌-সব্‌জির আচার অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়।

বাঁধাকপি।—বাঁধাকপির জলীয় ভাগ শতকরা ৮৯। বাঁধাকপি অপেক্ষা ফুলকপির শীঘ্রই পরিপাক হয়।

সীমের মধ্যে আঁস ভাগ অধিক থাকায়, ইহার পরিপাক হওয়া ও শরীরে শোষণ হওয়া দুরূহ।

সাগুদানার শতকরা ৮৬॥ ভাগ শ্বেতসার। সেজন্য ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহা তালজাতীয় সাগুদানা-বৃক্ষের কাণ্ডের অন্তঃসার হইতে প্রস্তুত হয়।

বাদাম-জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহার কঠিন ছালের মধ্যে কোমল বীজ থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর আহার্য্য। ইহার তৈলময় অংশ শতকরা ৫০।৬০ ভাগ, আঠাল দ্রব্যের অংশও ১৫।২০ ভাগ এবং চিনি ও আঁশের অংশ অধিক। বাদামের উপাদান শুষ্ক ও টাট্‌কা দানার উপর নির্ভর করে।

দুগ্ধের ছানা অপেক্ষা বাদাম পুষ্টিকর; কিন্তু ইহার আঁশ ও তৈলীয় ভাগের জন্য ইহার পরিপাক হওয়া একটু কষ্টকর। বাদাম-জাতীয় ফল হইতে আজকাল margerine প্রস্তুত হয়। ইহা আকার ও আস্বাদে মাখনের সমতুল ও আজকাল মাখনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ইহা মাখন অপেক্ষা খুবই সস্তা। নারিকেল, চিনাবাদাম, বাদাম প্রভৃতি এই জাতীয়।

মটর, সীম ও মুসুরীর প্রধান উপাদান protein অথবা আঠাল পদার্থ।—সে-জন্য ইহকে বিলাতে "Poorman's Beef" অথবা গরীবের মাংস বলে। ইহাতেও চিনির ভাগ বেশী। এই সকল আহার্য্যই অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহার ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে শরীরে শোষিত হয়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা আহার,—কিন্তু ইহাতে তৈলময় ভাগ কম থাকায়, ইহা অন্য আহার্য্য দ্রব্য হইতে লইতে

হয়। শুষ্ক মটর ও শীমের বীজ খুব ভাল রূপে জলে ভিজাইয়া উপরের ছাল নরম হইলে পরে রন্ধন করা উচিত, যদিও ইহাতে ইহাদের কোন কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ নষ্ট হয়। যে জলে চূণের পরিমাণ অধিক, তাহাতে কোন দ্রব্য ভিজান কিংবা রন্ধন করা উচিত নয়। ফুটান জল অবশ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিংবা কিছু সোডা জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাঁচা মটরের মধ্যে চিনির ভাগ বেশী এবং শীমের বীজে আঠাল অংশ মটরের অপেক্ষা অধিক। মুসুরির মধ্যে এই অংশ আরো অধিক এবং ছোট জাতীয় মুসুরই উৎকৃষ্ট। লৌহ ইহার একটী প্রধান উপাদান। ইহা মটর ও শীম অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়।

ব্যথিতা।

(গল্প)

শেফালিকা বারান্দার রেলিংএর কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্করী আসিয়া ডাকিল—"বৌদি, নাইতে যাবে না?" মুখ না ফিরাইয়াই শেফালিকা জবাব দিল—"না।" "কেন?" "যেতে ইচ্ছা নেই।" অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া চোখের তারা কপালে তুলিয়া শঙ্করী কহিল—"যেতে ইচ্ছা নেই! সে কি কথা? আজ দশহরা, আজ গঙ্গায় নাইতে যেতে ইচ্ছে নেই?" কথায় বেশ একটু জোর দিয়া শেফালিকা উত্তর দিল—"সত্যই যেতে মন নেই ঠাকুর-ঝি, তোমরা যাও।" শাশুড়ী কয়েকবার ডাকিলেন, যায়েরা সাধিল, শেফালিকা প্রত্যেককেই ফিরাইয়া দিল।

রেলিংএর উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল, গঙ্গা নাইতে গিয়া আজ সে কি করিত! দশ রকমের পাপ ধুইয়া আসিত, —না, কিছু অর্জ্জন করিয়া আনিত? ভাবিতে ভাবিতে মাস-পাঁচ-ছয় আগেকার কথা তা'র মনে পড়িল।

তখন শেফালিকা বাপের বাড়ীতে। বি-মাতার সংসারে তা'র কিছুমাত্র দাবী নাই, এ-কথা সে সর্ব্বদা মনে রাখিতে চেষ্টা করিলেও এক এক সময়ে বিমাতার উপরে স্নেহের অধিকার জানাইতে তার ইচ্ছা হইত। তা'দের বাড়ীতে রুক্মিণী বলিয়া একটী ঝি ছিল। তা'র মেয়ের যখন খুব অসুখ,—তখন সে গৃহিণীর কাছে গোণা দুইটী দিনের ছুটি চায়। শেফালিকা সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। মা কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া সে কহিল—"দু'-দিনের ছুটি দিয়েই দিন্ না মা! সে দু'দিন কাজ-কর্ম্ম সব আমিই করব।"

ঝির সম্মুখেই মা জবাব দিলেন—"আমার সংসারের মধ্যে তুমি গিন্নিপনা করতে এসো না। তোমার উপদেশে আমি চল্‌তে পারব না।" এ-কথায় শেফালিকার যেন মাথা কাটা গেল। রুক্মিণীর মুখের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকাইয়াই সে সে-ঘর হইতে বাহিরে আসিল।

রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, রুক্মিণী

আসিয়া শেফালিকার পায়ের কাছে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল ; বলিল—"মা তো আমাকে ছুটি দিলেন না দিদিমণি! ও-মাসের বাকী মাইনেটাও দিলেন না। আমি এখন কি করি? কি ক'রে মেয়েটাকে বাঁচাই? গরীবলোককে কেউ যে হাওলাতও দেয় না!" শেফালিকা তখন কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিল। হাতে তার কিছুই ছিল না। শ্বশুর-বাড়ীতে, বাপের বাড়ীতে সকলেরই এক ধারণা—খাওয়া-পরার অতিরিক্ত শেফালিকার আর কিছু খরচ থাকিতেই পারে না। তাই শূন্য-হাতে শেফালিকা ঝিকে ফিরাইয়া দিবার কথা ভাবিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সে ভাবনা যে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক। শেফালিকা নিজের কাণের একটি ফুল খুলিয়া ঝির হাতে দিল।

পরদিন সকাল বেলা যখন শেফালিকার কাণের একটি ফুল পাওয়া গেল না, তখন বিমাতা তাকে রীতিমত গালাগালি দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ; সেই মুহূর্ত্তে ঘটনাটিকে বেশ করিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া সাজাইয়া, তাহার শাশুড়ীকে এক চিঠি দিলেন।

শেফালিকা কতবার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, নিজের গহনা সে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়াছে ;—ইহার মধ্যে আবার দোষ কোথায়? কিন্তু দোষ যে কোথায় তাও শেফালিকা জানিত। গহনাগুলিকে যদি নিজের বলিয়া ভাবিবার তার অধিকার ছিল, তবে সে এমন লুকাইয়া তা দান করিল কেন? যে কাজ প্রকাশ্যে করিবার উপায় অথবা সাহস নাই, সে কাজের স্বপক্ষে যুক্তি-তর্ক খাড়া করাই যে আত্মপ্রতারণা করা, শেফালিকা তাহা বুঝিত।

যে-দিন সে শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তার পরদিন মহাবারুণী। তার মনে আশা ছিল, আত্মপ্রবঞ্চনার পাপ গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়া সে পবিত্র হইতে পারিবে। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে শেফালিকা দেখিল গাড়ীর দুই ধারে অনেকগুলি ভিক্ষুক জমিয়াছে। তার মধ্যে একটি ছেলে।—কি ভয়ানক রোগা সে! হাত-পাগুলি যেমন সরু সরু, চোখের দৃষ্টিটিও তেমনি করুণ। তার দিকে তাকাইয়া শেফালিকা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না ; মৃদুস্বরে বলিয়া ফেলিল, "মা ওকে দুটি পয়সা দিন।" শাশুড়ী বলিলেন, "ক্ষেপেচ বৌমা! কত কষ্টের রক্ত-জল-করা পয়সা এই সব গোদা-গোপ্‌সা মাগী-মিন্‌সেদের মধ্যে বিলোবো? ও-সব হবে টবে না বাপু।"

শেফালিকা আর কিছুই বলিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই রোগা ছেলেটির সঙ্গে শেফালিকার করুণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছিল। মৌন করুণ দৃষ্টির ভিতরে করুণার সন্ধান পাইয়া দুর্ব্বল বালক যথাশক্তি গাড়ীর পিছু পিছু দৌড়িল।

গাড়ী যখন চোখের আড়াল হইল, তখন সেই বালকটি কি করিয়াছিল? নিরাশার প্রবল আঘাতে এবং শারীরিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া নিশ্চয় সে বসিয়া পড়িয়াছিল।

—কি তখন ভাবিতেছিল সে?—

শেফালিকা আর ভাবিতে পারিল না। বারান্দার উপরে বসিয়া পড়িয়া আকাশের

দিকে তাকাইয়া যোড় হাতে বলিল—"হায় ভগবান্, আমাকে যদি অক্ষমতার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছ, তবে অন্ধ কর নাই কেন?"

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

অনন্তের প্রতি।

অনন্ত আকাশ-তলে জাগে ওই অনন্তের ছবি!
মিছেই মরিনু ঘুরে, তাঁরে তো কখন নাহি ভাবি!
সুন্দর ধরায় আমি বৃথা হায়, খাটিলাম কত,
একবার ভাবি নাই কা'র কাজে আছি
নিয়োজিত!
ধনের লালসা করি ঘুরে মরি এ-দেশ সে-দেশ!
কোথাও গো সুখ নাই, প্রাণে নাহি শান্তির
লেশ।
ক্রমেতে যেতেছে কেটে জীবনের গণা দিন-
ক'টা।
সম্মুখেতে ভীম মেঘ আসিতেছে করি ঘন ঘটা!
এত মরিলাম খেটে, মিটিল না জীবনের তৃষা!
এখন আঁধার সব, সম্মুখেতে মহা অমানিশা!
কেমনে আঁধারে হাঁটি' যাব সেই অনন্তের পথে?
এই সব পরিজন কেহ তো যাবে না মম সাথে!
এখনো তাপিত প্রাণে যেতে চাই অনন্তের
কোলে;
তাপিত জনার স্থান মিলিবে কি সেই পদতলে!

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

অপ্রাকৃতে বিশ্বাস।

আজকাল ইয়ুরোপে প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। গণ্ডায় গণ্ডায় মিডিয়াম্ (Medium) আবির্ভূত হইতেছে এবং ভূতের সহিত সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কথাবর্ত্তা চালাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে। মহা মহা জড়বাদিগণ, যাঁহারা এতদিন জড়বাদের (Materialism) স্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা এখন ক্রমে ক্রমে ভূতে বিশ্বাসী হইতেছেন; এমন কি কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও ভূতবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আবিষ্ট অবস্থায় মিডিয়ামের গাত্র হইতে একটী আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নির্গত হয়; ইহার নাম Ectoplasm; এই Ectoplasmই মৃতের আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং আত্মীয়স্বজনগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। এই Ectoplasmএর স্বরূপ-নির্ণয়ে এখন বৈজ্ঞানিকগণ অতিব্যস্ত। কেহ ইহাকে দগ্ধ করিতেছে, কেহ ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতেছেন, কেহ বা বোধ করি, রসায়নাগারে ইহা প্রস্তুত করার চেষ্টাও করিতেছেন। ভূত-তত্ত্বে বৈজ্ঞানিকগণ এতটা অগ্রসর হইয়াছেন যে, মৃত আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাধারণ দেখা-শুনা কথা-

বার্ত্তা ত সামান্য কথা, তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করা হইতেছে, পরলোক-সংক্রান্ত বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার দরুণ নিজকে পূর্ব্ব হইতেই পরলোকের জন্য প্রস্তুত রাখিবার সুবিধা হইতেছে। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, সেদিন একখানি মাসিকপত্রে দেখিলাম, কোন এক বিজ্ঞান-ধুরন্ধর ভূতদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য পরলোক ও পৃথিবীর মধ্যে টেলিফোন্ চলিতে পারে,এরূপ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন্। এই অভিনব টেলিফোনের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া, Mouth-pieceটী ধরিয়া প্রেত-লোকস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত আরামে কথা-বার্ত্তা কওয়া যাইতে পারে; তাঁহাদিগকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই নর-পৃথিবীতে আসিতে হইবে না। ব্যাপার যখন এতদূর গড়াইয়াছে, তখন কোন্ দিন বা অলিঘ-ভূত-রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে; বড় বড় ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত Howeitzar লইয়া প্রেতরাজ্য ধ্বংস করিয়া, ভূতদিগকে ধরিয়া আনিয়া পৃথিবীতে 'ভূতের-মত' খাটান হইতেছে।

আমাদের আদর্শ সভ্যদেশ ইয়ুরোপেই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য দেশের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাস্তবিক যতই সভ্যতা-লোকে আলোকিত হউক না কেন, ভূতে বিশ্বাস কোন দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয় না। অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য দেশগুলিতে ভূতের অস্তিত্ব জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঐ সকল দেশে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহ যাইতে সাহস করে না, যাইবার ইচ্ছাও করে না, যাইবার ক্ষমতাও কাহারও নাই। সভ্যতা-হিসাবে যে জাতি যত নিম্নে, সে জাতির ভূত-বিশ্বাস ততই অধিকতর প্রকট। কিন্তু কোন জাতি যখন নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করে, অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার ভূতে বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আসে; এবং যখন অতিউচ্চে উঠিয়া সভ্য বলিয়া গণ্য হয় ও স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখে তখন এই বিশ্বাস প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়; কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না। মনের অতিগভীর অংশে ইহা সমাহিত হইয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলেই ইহা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠে। ইয়ুরোপের এখন সেই অবস্থা হইয়াছে। এতদিন সমাহিত অবস্থার পর তথায় ভূতে বিশ্বাস সুপ্ত বিসু-বিয়সের ন্যায় পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ভূতে বিশ্বাস করাটা মানুষের স্বভাব। মনুষ্য-প্রকৃতি এরূপভাবে গঠিত যে, ইহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। একটা কিছু অপ্রাকৃত, যাহা এই পৃথিবী হইতে বিভিন্ন, একটা কিছু আশ্চর্য্য, একটা কিছু অদ্ভুত, যাহা সচারাচর ঘটে না, একটু কিছু ধূমাচ্ছন্ন কুহেলিকাময় রহস্যময় অর্দ্ধদৃশ্য অর্দ্ধাদৃশ্য ব্যাপার, যাহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যায় না—এই রূপ একটা কিছু মৃত্যুর পর ঘটে, এই বিশ্বাস না করিয়া সাধারণ মনুষ্য বাঁচিতে পারে না। ছাদ যেরূপ স্তম্ভ না থাকিলে পড়িয়া যায়, সাধারণ মনুষ্যও তদ্রূপ একটা কিছু কাল্পনিক অপার্থিব বস্তুর উপর ভর না করিলে দাঁড়াইতে পারে না। মৃত্যুতেই সব শেষ; যতদিন পৃথিবীতে আছি, ততদিনই অস্তিত্ব আছে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের

জন্ম অনস্তিত্বে (nothingness) ডুবিয়া যাইব, বিশ্বের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যাইব, অথবা আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে পুনরায় কখনও তাহাদের দেখিতে পাইব না, কখনও তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না, গতকল্য যাহাকে সহাস্যমুখে কথা কহিতে দেখিয়াছি আজ তাহার মৃত্যুতে সে চির-কালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল, আর তাহার কখনও দেখা পাওয়া যাইবে না, ভালবাসার সামগ্রী প্রেমের পাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে, সে আদৌ না থাকিলে যাহা হইত সেইরূপ হইবে, অনন্ত-কালের জন্য তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না,—এই সকল ভয়াবহ কল্পনার উপর দাঁড়াইবার শক্তি সাধারণ মনুষ্যের নাই। সেইজন্য মানুষ কাল্পনিক কিছু খাড়া করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইতে চায়। এই প্রকারে পরলোকে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বাস স্বভাবজ। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাধীনচিন্তাশক্তি-হীনতা হেতু নিজ নিজ স্বভাব-দ্বারা চালিত হইয়া ভূতে বিশ্বাস করে। ক্রমে তাহাদের স্বাধীন-চিন্তাশক্তি যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই তাহারা সহজ স্বভাব-চালিত পথে না চলিয়া, যাহা সত্য তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য তখন তাহাদের ভূতে বিশ্বাসের হ্রাস হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভূতে বিশ্বাস করা মানুষের স্বভাব। এক্ষণে দেখা যাউক ভূতবাদি-গণ ভূতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কি প্রমাণ দেন। প্রথমতঃ ভূত কি ?* ভূতের সম্বন্ধে সকলেরই কিছু না কিছু ধারণা আছে; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

মৃত্যুর পরের অবস্থা ভূত। কিন্তু সকলকে কি ভূত হইতে হয়? ইহার উত্তরে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কথা বলে। কোন জাতি লে, অপঘাতে মৃত্যু হইলে ভূত হইতে হয়; কোন জাতি বলে জীবন ধরিয়া অসৎকার্য্য করিলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়; আবার কোন কোন জাতি বলে সদসদ্‌নির্ব্বিশেষে সকলকেই ভূত হইতে হয়। যাহা হউক, একটী বিষয়ে সকলেই একমত যে, ভূতাবস্থা মৃত্যুর পরের

---

* কেহ বলেন ভূত একপ্রকার অশরীরী প্রাণী, কেহ বলেন, ইহা এক প্রকার হাওয়া, কেহ বলেন, ইহা সূক্ষ্ম দেহধারী জীবাত্মা। এইরূপ নানা মত প্রচলিত আছে। ইহাদের আকারসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কেহ বলেন, ইহা তালগাছের ন্যায় লম্বা, কেহ বলেন ইহা মনুষ্যের কঙ্কালের ন্যায় দেখিতে, আবার কেহ বলেন ইহা জীবিতাবস্থায় যে আকারে ছিল সেই আকারেই দৃষ্ট হয়। ভূতদিগের বর্ণ সাধারণতঃ মসী-বিনিন্দিত হয়। ইহাদের মুখাকৃতি যে যত ভীষণ কল্পনা করিতে পারিবে, সে ততই সত্যের নিকটবর্ত্তী হইবে। জাতিদেশেই ভূতের শ্রেণী-বিভাগ আছে; আমাদের দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর ভূতের কথা শুনা যায়। সাধারণ ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, গোভূত, ব্রহ্মদৈত্য, মামদো ইত্যাদি। পাঠক ভূতপেত্নী-নামক পুস্তকে খোঁজ করিলে আরও বিস্তর নাম পাইবেন। মনুষ্যের ন্যায় ভূতদিগের লিঙ্গ-ভেদ আছে; পেত্নী ও শাঁকচুন্নী স্ত্রী-ভূত, অন্যান্য গুলি পুরুষ-ভূত। ইহাদের আবার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে; সেই স্থানকে হানা জায়গা (haunted) বলে। ইহাদের বাহির হইবার একটী সময় বাঁধা আছে। (১) দুপুর বেলা (২) দুপুর রাত্রি। অমাবস্যার রাত্রিতে ইহাদের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়। ইহারা নাকী-সুরে কথা কহে ও সুবিধা পাইলে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গে। স্ত্রীভূতগণ বড় মৎস্যপ্রিয়। এইরূপ বহু প্রবাদ আছে।

অবস্থা। এক্ষণে প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে মনুষ্যের কি অবস্থা হয়?

এই প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে। মৃত্যুর পরের অবস্থা জীবিতাবস্থায় কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সব কয়টা উত্তরই আনুমানিক। এই আনুমানিক উত্তরগুলির মধ্যে যেটা একটু বিশ্বাস্য সেইটাই গ্রহণযোগ্য। প্রথমতঃ ধরা যাউক, মৃত্যুর পর আমাদের কি অবশিষ্ট থাকে? মৃত্যুর অর্থ জড় দেহের ধ্বংস। অতএব জড়দেহ মৃত্যুর পর থাকে না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের প্রাণ বলিয়া যদি দেহাতিরিক্ত কিছু থাকে, মৃত্যুর পর তাহাই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এই প্রাণ জড়েরই যদি রাসায়নিক রূপ-পরিবর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেহের ধ্বংসের সহিত প্রাণেরও ধ্বংস হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মৃত্যুর সহিত সব শেষ। এতদনুযায়ী ভূত বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। ইহারই নাম জড়বাদ (materialism)। ইহার মূলমন্ত্র চার্ব্বাকের সেই অমর কাহিনী 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' এক্ষণে প্রাণ বলিয়া জড় হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া যাউক। প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও ভূতে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। জড় দেহ পরিত্যাগ করিয়াই যে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূত সাজিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি! প্রাণের স্বরূপ কেহ জানে না। এই প্রাণের কত প্রকার অবস্থা হইতে পারে, কে তাহা জানিবে? বস্তুতঃ, এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এমন কি পুনর্জ্জন্মে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভূতবাদিগণ এ-দিক্ হইতে কিছু বলিতে পারেন না। এক্ষণে তাঁহারা প্রত্যক্ষের দিক্ হইতে কি বলেন দেখা যাউক। প্রত্যক্ষ ভূত দেখাইতে পারিলে অকাট্য তর্ক অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস হয়। ভূতবাদিগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাবও নাই; তবে দুঃখের বিষয় প্রত্যেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতেই আজকাল কিছু না কিছু গলদ বাহির হইতেছে। প্রেত-তত্ত্বের মধ্যে এই প্রত্যক্ষপ্রমাণ অংশটাই নিতান্ত আজগবী-ব্যাপার; সুতরাং, সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ-যোগ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুত্তর।

শুভ্র জোছনা-রাতে
কে যেন রে কোথা হতে
বলে মোরে ডেকে ডেকে—
"ওরে দিন বহে যায়,
এখনো মোহের ঘোর
ভাঙ্গিল না কিরে তোর?

জীবনের দিনগুলি
একে একে গেলে চলি,
হতাশের শ্বাস ফেলি
শেষে কি কাঁদিবি, হায়?"
আমি আকাশের পানে
চেয়ে রই শূন্যমনে,

সুধাংশু-বদন হেরে
ভাসি শুধু অশ্রু-নীরে।

কি কথা যে কব তারে
ভেবে কিন্তু নাহি পাই।

শ্রীমতী বিনয়কালী দেবী।

বিবিধ।

১। একজন ফরাসীদেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহাদের মাথায় চুল কম, তাঁহারই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তিনি বলেন যে, চুল গজাইতে অত্যধিক পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি আমাদের মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিচালনা হয়, তাহা হইলে জীবনীশক্তি ঐ কাজেই ব্যাপৃত থাকে, চুল উঠিবার জন্য আর তাহা ব্যয়িত হইতে পারে না। অধিকন্তু চিন্তার চাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং খুলিকে ঠেলিয়া তুলে। সেইজন্য মস্তকের চর্ম্মের উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সে-গুলি রুদ্ধ হয়, এবং চুলের গোড়ার ক্ষতি হয়। পরিণাম এই হয় যে, অত্যন্ত চিন্তাশীলতার জন্য মাথায় টাক পড়িয়া যায়।

চিকিৎসকপ্রবর পশুজীবন হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। লোমাবৃত ভেড়া বুদ্ধিহীনতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। হস্তীর গায়ে লোম খুব কম; ফলে হস্তীর অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সীল-মৎস্য, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু মনুষ্য-কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া অত্যধিক-পরিমাণে বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাদের গাত্রে অধিক লোম জন্মে না।

যাঁহার মস্তক কেশহীন, তাঁহার এতদিন কেবল এই সান্ত্বনা ছিল যে, টাক টাকার চিহ্ন, কিংবা কেশের অভাব-দুঃখ অদূর ভবিষ্যতে টাকার প্রাচুর্য্যে দূরীভূত হইয়া যাইবে। আজ এই সিদ্ধান্ত আর একটি নূতন আশ্বাসবাণীর সৃষ্টি করিল।

২। যাঁহারা দিবসে অনেকক্ষণ ধরিয়া মস্তিষ্ক-চালনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কাজ করিবার পর পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বেড়ান ভাল; আর নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করা উচিত। ইহাতে মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ সম্ভব না হইলে ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাত্রিকালের শীতল বায়ু সেবন করা উচিত।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে একবাটী উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও শীঘ্র ঘুম আসে। সম্ভব হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আধ-ঘণ্টা দিনের কার্য্য হইতে পৃথক অন্য কোন কার্য্যে ক্ষেপণ করা উচিত। ছাত্রেরা সঙ্গীত-সাধনায়, ব্যবসায়ীরা লঘু-সাহিত্যচর্চ্চায় এবং গৃহকর্ম্ম-নিরতা স্ত্রীলোকেরা কোন আনন্দপ্রদ-পুস্তক-পাঠে এই সময় অতিবাহিত করিতে পারেন। তাহাতে শরীর ও মন কিছুক্ষণের জন্য প্রফুল্ল হইয়া নিদ্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পারে।

৩। অধিকাংশ লোককেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহার দেহের গুরুত্বের অধিকাংশ ভাগ কি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা

হইলে তিনি খুব সম্ভবতঃ বলিবেন যে, অস্থি হইতে। সেটা তাঁহার ভুল। দেহের ওজনের প্রায় তিন চতুর্থাংশ জল। দেহ-রক্ষার নিমিত্ত জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বাহিরের উত্তাপের সমান হয়, তাহা হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। কারণ, আমাদের দেহের সাধারন উত্তাপ ৯৮॥ ডিগ্রি আর বাহিরের সাধারণ উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি। আমাদের শরীরের উত্তাপ ৯৮॥ ডিগ্রির অধিক হইলেই আমরা তাহাকে জ্বর বলি। আমাদের দেহের উত্তাপ যাহাতে না বাড়ে, সেইজন্যই আমরা জল পান করিয়া থাকি এবং জলই আমাদের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। জল আমাদের খাদ্য-পরিপাকে অনেক সাহায্য করে। যাঁহারা অজীর্ণ-রোগে কষ্ট পান, তাঁহাদের ঔষধের পরিবর্ত্তে জল পান করা কর্ত্তব্য।

অনেকে মার্কিনদিগের কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হন এবং ভাবেন—ইহাদের এই সকল উদ্ভাবনাশক্তি ইহাদের মিশ্রজাতিত্ব-সমুদ্ভূত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ, মার্কিনদিগের অত্যন্ত অধিকপরিমাণে জল-পান করা।

৪। জনৈক দন্তচিকিৎসক সম্প্রতি দন্ত পরিষ্কার রাখিবার বিষয়ে কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) প্রত্যেকবার আহারের পর বেশ করিয়া দাঁত মাজিয়া কুলকুচা করিবে।

(খ) দাঁতন না পাইলে বেশ করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিবে।

(গ) খুব শক্ত অথবা লম্বা দাঁতন বা ব্রাস ব্যবহার করিবে না। ছোট দাঁতন সকলের পক্ষেই উপযুক্ত।

(ঘ) উপরের ও নিম্নের দাঁত দাঁতন বা ব্রাসের দ্বারা পরিষ্কার করিবে; কিন্তু দাঁতের মাড়িতে যেন আঘাত না লাগে। দাঁতে কিছু লাগিয়া থাকিলে, দেশলাই বা অন্য কাঠি বা পিন প্রভৃতি দিয়া তাহা খুটিয়া বাহির করা অকর্ত্তব্য।

(ঙ) ব্রাসে মুখ ধুইলে ব্রাসটী তাহা সপ্তাহে একবার করিয়া কার্ব্বলিক সলিউসান-দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে।

(চ) নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার দাঁতন করা একান্ত কর্ত্তব্য। দাঁতের উপরিভাগ বেশ করিয়া দাঁতন দিয়া পরিষ্কার করিবে। বৎসরে অন্ততঃ একবার চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত-পরীক্ষা করাইবে। আহারের শেষে দাঁত পরিষ্কার রাখে এমন ফল খাওয়া উচিত।

৫। আমাদের যুবরাজ শীতকালে এখানে আসিবেন বলিয়া কথা হইয়াছে। এদেশে তাঁহাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করা হইতে পারে তাহার আন্দোলন হইতেছে। ভারতবর্ষ-ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্ভবতঃ তিনি জাপান যাইবেন। জাপান-সরকার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

৬। লণ্ডন-সহরে মহাভারতের সাবিত্রী-কাহিনী এক অঙ্কের গীতি-নাট্য-আকারে অভিনীত হইয়াছে। রচনা ইংরেজী ভাষায়। গান, দৃশ্য, প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

৭। পাটনা হাইকোর্টে শ্রীমতী সুধাংশু-বালা হাজরা নাম্নী এক মহিলা ওকালতি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

৮। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারে সহরে একরকম নূতন গ্রীষ্মকালীন পরিচ্ছদ আমদানী হইয়াছে। মিশর-দেশোৎপন্ন একপ্রকার

ঘাসের আঁস হইতে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। মিশর-দেশে ইহা হইতে উপাদেয় শাকের বন্ট রান্না হয়। এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ না-কি রেশম-তূলার পরিচ্ছদ অপেক্ষা বেশী টিকিবে।

৯। মার্কিণ রাজ্য কোটিপতির দেশ। মহিলাগণের মধ্যেও অনেকে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপের সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশে বা রাজবংশে বিবাহ করিতেছেন। ইহাতে মার্কিণ রাজ্যের অনেক ধনসম্পত্তি তাঁহাদের বিবাহের সহিত বিদেশে স্থানান্তরিত হইতেছে। আমেরিকার পক্ষে ইহা একটী বিষম ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১০। মাননীয় স্বাস্থ্য-সচিব মহাশয়ের অনুরোধে গত ১৩ই আগষ্ট রমণীদিগকে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিবার জন্য কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল টাউন হলে একটী পর্দ্দা সভা আহূত হইয়াছিল। ইহাতে কন্যা, পুত্রবধু, মাতা, শ্বশ্রূ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে প্রায় ৮০ জন ভদ্র মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিশু-মঙ্গল প্রভৃতি সাধনের জন্য বঙ্গীয় সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ-সহকারিণী কুমারী ম্যাকিনটোস সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা কুমারী ম্যাবেল সিংহের সহায়তায় নানাপ্রকার চিত্র, বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখান ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন। ম্যালেরিয়ার চিত্র দেখাইয়া বিশেষভাবে বলা হয় যে, এই রোগ দূর করিবার উপায় প্রত্যেক পরিবারের হস্তেই কিয়ৎ-পরিমাণে রহিয়াছে। বাটীর সন্নিকটে ভাঙ্গা টিন ও জিনিষপত্র, খোলা চৌবাচ্চা প্রভৃতিতে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মে। সমুদায় স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে আর মশা জন্মিতে পারিবে না এবং ম্যালেরিয়াও দূরীভূত হইবে।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

ইংরাজি-অনার্স

প্রথম শ্রেণী।

জুদারানা—ডাওসেসন কলেজ, ইলফম সোভায়লেট ইমেলিয়া—ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

লীলা নাগ—বেথুন কলেজ, এস বোস—এফ, এন, গীতা চট্টোপাধ্যায়—ডাওসেসন কলেজ, শ্যামসোহাগিনী ঘোষ এমিলি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সিসিল ডি একা—এফ, এন, নিখিলবালা গুপ্ত—বেথুন, ফিরোজ মানেকজী মাহের—ডাওসেসন।

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা।

সরযুবালা বসু—বেথুন, মণিক. চট্টোপাধ্যায়-ঐ, সুধা দত্ত—ঐ, গৌরীপ্রভা ডুমারা—ডাউসেসন, সুধীরবালা গুহ— বেথুন, মার্গারেট শান্তিময়ী রাওরাণী—ডাওসেসন, কমলা সরকার—এফ, এন, মালতী সরকার—ডাওসেসন

পাশলিষ্ট।

লাবণ্যলেখা ব্যানার্জ্জি—বেথুন, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, অমিয়প্রভা ভট্টাচার্য্য—ঐ, আশালতা খ্রীষ্টিয়ান—ডাওসেসন, সুমতিবালা দাস—বেথুন, সুমতিবালা দত্ত—ঐ, এনি সারা—ডাওসেসন, সুমতিবালা গুহ—ঐ, লক্ষ্মি জগুমল—বেথুন।

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৮—অক্টোবর, ১৯২১।

সূচী

---

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।০ (চারি আনা) মাত্র।
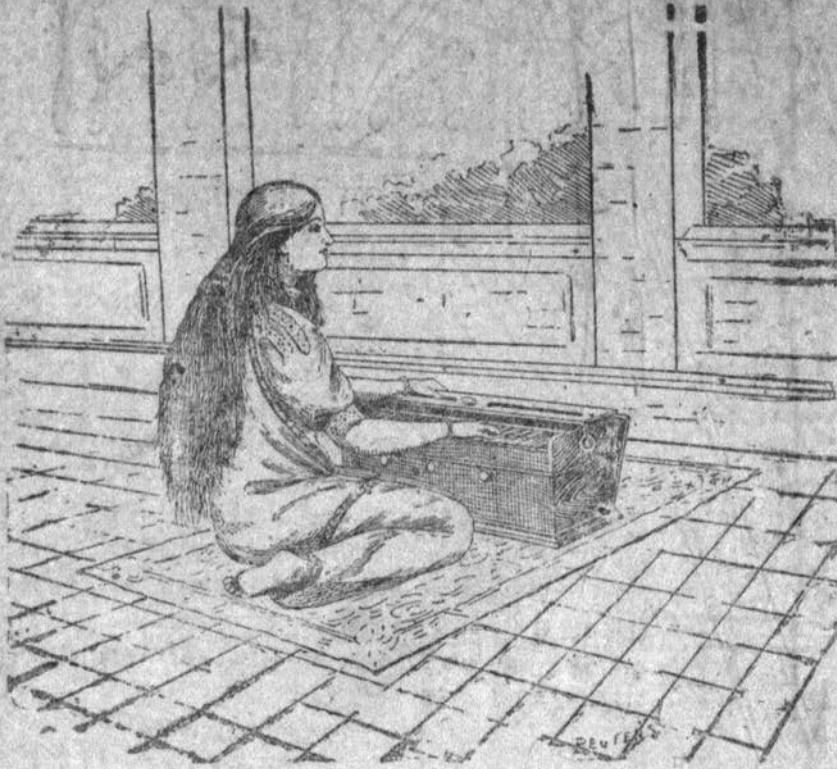
বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 698. October, 1921.

"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৬৯৮ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৮। অক্টোবর, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

শরতের গান।

(ইমন পূরবী একতালা)

এই গগনের নীল-পাথারে
কি করুণ নয়নে চাও!
নিমেষে সকল হৃদয় পরাণ
কেমনে হে তুমি ভুলাও।
তব অপরূপ কান্তি
হৃদে ঢালে এ কি শান্তি,
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি!—
কি মোহন বাঁশরী বাজাও!

একি ফুলে ফুলে তব হাসি,
একি ইন্দু পৌর্ণমাসী,
একি শ্যাম ঘন তৃণরাশি
চরণের তলে বিছাও!
একি আলো-ছায়া তব ভুবনে,
একি সুখ দুখ মম জীবনে,
একি নৃত্য জনম-মরণে!—
কি অপরূপ খেলা খেলাও!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

শিশুশিক্ষার পথ-প্রদর্শক।

য়ুরোপের আর একটি শিশু-বিদ্যালয়।

স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাসগো নগরের নিকটবর্ত্তী নিউল্যানার্ক-নামক স্থানে উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে মোট ২৪৬ জন বালক ও ১৯৮ জন বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। তাহাদের মধ্যে ২০ জন তিন বৎসরের,

৫৬ জন চারি বৎসরের, ৫৯ জন পাঁচ বৎসরের, ৪৮ জন ছয় বৎসরের এবং বাকি সব সাত হইতে দশ বৎসরের। এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপক রবার্ট ওয়েন একজন সদাশয় ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তথাকার 'সূতার কলের' একজন স্বত্বাধিকারী ও কর্ম্ম-কর্ত্তা ছিলেন। কলের শ্রমজীবিগণের শিশু-সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার দয়া-প্রবণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। বহুদিনের চেষ্টার পর, নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তিনি তাহাদের শিক্ষার জন্য তথায় এই আশ্রমটি সংস্থাপন করেন।

এই বিদ্যালয়ে তিন বৎসর বয়সে শিশু-দিগকে গ্রহণ করিয়া সদ্‌দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহাদিগকে সদ্‌ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহারা যাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং প্রয়োজনানুসারে একে অন্যের সাহায্য করে,—তাহা কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত। শুধু উপদেশের সাহায্যে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহা কার্য্যকরী হয় না। বিশেষতঃ এইরূপ কোমলমতি বালক-বালিকাগণ ঐরূপ উপদেশবাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত শিশুজীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এরূপ কৌশল সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত যে শিশুগণ স্বতঃই এই বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিত। তাহাদের স্বাস্থ্য যাহাতে ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহারা যাহাতে দিন দিন বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠে, তাহাদের সদা-প্রফুল্ল হৃদয় যাহাতে ক্রমোন্মেষের পথে ধাবিত হয়, তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

বর্ষা-ঋতুতে বিদ্যালয় গৃহমধ্যে বসিত, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল অম্বরতলে প্রমুক্ত বায়ুতে বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। মুক্ত-বায়ুতে অবাধভাবে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করিবার সুযোগ পাওয়াতে, শিশুদের শরীরে বেশ বল-সঞ্চার হইত; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনও সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিত। ছয় বৎসরের অধিকবয়স্ক শিশুগণ সাধারণতঃ ভোরবেলা ৭॥ সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এবং এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর, ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত। বৈকাল বেলা আবার ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত স্কুল বসিত। কিন্তু শীতকালে ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত এক-বেলাই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। ছয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুগণ ইহার অর্দ্ধেক সময়-মাত্র বিদ্যালয়ে থাকিত। দিবসের অবশিষ্ট সময় শিশুগণ একজন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের পুরোবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবাধে স্বেচ্ছামত আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক করিত।

শারীরিক বল ও মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে শিশুগণ এই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই বা তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিত, এবং যখন তাহারা উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষা ও সামর্থ্য লাভ করিত, তখন তাহাদিগকে সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হইত। এই উচ্চতর বিদ্যালয়ে তাহাদের লেখা, পড়া ও গণন আরম্ভ হইত। বালিকাদিগকে এতদ্ব্যতীত

সেলাইও শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এখানেও শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ ছিল—অভ্যাসের সাহায্যে চরিত্র-গঠন। এখানে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকেরা অধ্যয়ন করিত। এই সময়ে প্রতিদিন এক বা দুই ঘণ্টা করিয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর ও নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত করা হইত। কেহ কেহ বা সঙ্গীত-চর্চ্চা করিত, কেহ কেহ বা নৃত্যশিক্ষা করিত, আবার কেহ কেহ বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিত। এই শিক্ষাকালের অন্তে তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সূতার কলের কাজে অথবা অন্য কোনরূপ কাজে নিযুক্ত হইত। কিন্তু যে-সকল শিশুর মাতা-পিতা সন্তানের অর্জ্জিত অর্থের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারিত, তাহারা নিজ নিজ সন্তানকে আরও এক দুই বা তিন বৎসর সেই বিদ্যালয়ে রাখিয়া দিত। এই সময়ে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষাই সাধারণতঃ লাভ করিত। যাহারা কলের কাজে নিযুক্ত থাকিত, তাহারাও ইচ্ছানুসারে দিবসের কার্য্যাবসানে সান্ধ্য বিদ্যালয়ে ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবার অনুমতি পাইত। এইরূপ সান্ধ্যশিক্ষা ও ক্রীড়াকৌতুক সাধারণতঃ দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া চলিত। এই শিক্ষা ও ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা এরূপ সুন্দরভাবে করা হইত যে, আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া অলক্ষিতভাবে বালকবালিকাগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতে পারিত, অথচ কোনরূপ শ্রম বা বিরক্তি অনুভব করিত না।

শিশুগণ হাঁটিতে শিখিলেই ওয়েন তাহা-দিগকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতেন; এমন কি, কখনও কখনও তিনি এক বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম এই সকল শিশুর মাতাপিতা বুঝিতে পারিত না যে কেন ওয়েন এই সকল অপোগণ্ড শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করেন। কিন্তু পরে যখন তাহারা দেখিত যে, সুশিক্ষার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে শিশুদের ব্যবহারে ও কার্য্যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তখন তাহারা শিশুদিগকে এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং ওয়েনকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তিনি এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু গ্রহণ করিতে পারেন কি না।

এই বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী অতিমনোরম ছিল। কঠোর শাসনের কোনরূপ দৌরাত্ম্য তথায় ছিল না। গভীর স্নেহসহকারে এমন চিত্তাকর্ষক উপায়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে, তাহাদের মত সদা-প্রফুল্ল, সজীব ও সতেজ শিশু খুব কমই দৃষ্টিগোচর হইত। শিশুদিগকে পুঁথিগত শব্দের সাহায্যে নীরসভাবে কোনও শিক্ষা দেওয়া হইত না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে এবং প্রকৃত বস্তুর অভাব হইলে উহার আদর্শ বা চিত্রের সাহায্যে অতি-উপাদেয়ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষক কখনও কখনও বা কথোপ-কথন ও গল্পের সাহায্য লইতেন।

যে গৃহে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত, সেই গৃহ জীব-জন্তুর নানাচিত্রে সুশোভিত থাকিত। প্রাচীর-গাত্রে বিভিন্ন দেশের মান-চিত্র বিলম্বিত থাকিত। উদ্যানজাত, বনজাত

ক্ষেত্রোৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার উক্তগৃহে স্তরে স্তরে বিপণির পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় সুবিন্যস্ত-ভাবে সজ্জিত থাকিত। এই সকল দ্রব্য স্বভাবতঃই শিশুদিগের হৃদয়ে কৌতূহলবৃত্তির উদ্রেক করিত এবং তাহারা আগ্রহভরে সেই সকল দ্রব্য-সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিত। তখন শিশুদের অন্তরে জাগ্রৎ জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শিক্ষকগণ সেই সকল দ্রব্য লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিতেন এবং অতিসুন্দর ও সহজ-ভাবে সেই সকল দ্রব্য-সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান শিশুদিগকে প্রদান করিতেন। এইরূপ শিক্ষা শিশুদিগের নিকট কখনও নীরস বা নির্জীব বোধ হইতে পারে না; তাই তাহারা এই সকল আলোচনা হইতে একসঙ্গে জ্ঞান ও আমোদ উভয়ই লাভ করিত; এবং শিক্ষার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাও সিদ্ধ হইত।

ওয়েন ছয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদিগকে পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু শিশুদিগের জনকজননীর পীড়াপীড়িতে তিনি যদিও অবশেষে উক্ত শিশুদিগকে পঠনপ্রণালী শিক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্ব্বদা এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে শিশুদিগকে অক্ষর প্রভৃতি মানবকল্পিত চিহ্নের নীরস ও জীবন-হীন শিক্ষা প্রদান না করিয়া, ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির সাহায্যে সহজ- ও সরল-ভাবে শিক্ষা প্রদান করাই স্বভাবানুমোদিত ও বিজ্ঞান-সম্মত; এবং নৈসর্গিক বস্তুর সাহায্যে জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জগতের সাধারণ জ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের স্থূল তত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের তত্ত্বের কৌতুক-কর ঘটনা প্রভৃতি অতি উপাদেয়ভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পুস্তকের সাহায্যে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে যাইলে শিশুগণ তাহাতে কোনরূপ আমোদ অনুভব করিতে পারে না, অথবা কোনরূপ জ্ঞানলাভেও সমর্থ হয় না। উহাতে শিশুগণ শুধু কতকগুলি শব্দমাত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। সুতরাং শিক্ষারি নামে স্বাধীনভাবে মনোবৃত্তিবিকাশের পথে কতকগুলি অন্তরায়মাত্র সৃষ্টি করা হয়।

পুরস্কার বা তিরস্কার শিশুচরিত্রে স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। ইহা-দ্বারা শিশুর ইষ্ট অপেক্ষা বরং অনিষ্টই সাধিত হয়। তাই শিশুর চরিত্র-সংশোধন-ব্যাপারে এইরূপ কোনও উপায় অবলম্বন করা অস্বা-ভাবিক ও অবৈধ। যখন শিশু কোনরূপ অন্যায় আচরণ করে, তখন তাহাদিগকে কৃপাপাত্র বা অপরাধী জ্ঞান করা উচিত নয়। তখন শিশুর হিতাহিত-জ্ঞান জন্মে না। কাজেই সে চতুর্দ্দিকে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহারই অনুকরণ করে। শিশুকে ভাল করিতে হইলে কুদৃষ্টান্ত হইতে তাহাকে দূরে রাখিতে হইবে এবং সদ্‌দৃষ্টান্ত তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। সময় সময় তিরস্কারেরও আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু সেই তিরস্কার কঠোর বা কঠিন শাস্তিরূপে প্রদান না করিয়া যাহাতে সদয় উপদেশরূপে অর্পিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শিশুবিদ্যালয়ের শিক্ষকের যে যে গুণ

থাকার প্রয়োজন, তাহা একাধারে বড় দুর্ঘট। শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে অত্যধিক বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন হয় না সত্য, কিন্তু শিক্ষকের অপরিসীম ধৈর্য্য ও স্নেহপ্রবণ হৃদয় না থাকিলে, এ-বিষয়ে তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন না। তাই শিশুবিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষক-সংগ্রহের জন্য রবার্ট ওয়েনকে সর্ব্বপ্রথমে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি তাহার পছন্দমত শিক্ষকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই শিক্ষক স্বভাবতঃই শিশুদিগকে ভাল বাসিতেন; সহজে কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না।

শিক্ষকটীর এরূপ প্রকৃতি হইবার কারণও ছিল। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় রোষপরায়ণা রমণী ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞার পালন না করিলে স্বামীর আর রক্ষা ছিল না। তাই সর্ব্বদাই পত্নীর নিকট তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত এবং পত্নীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাহাকে অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইত। এইরূপ প্রিয়তমা শিক্ষয়িত্রীর অধীনে থাকিয়া তিনি স্বগৃহে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-ব্যাপারে সেই শিক্ষা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। স্ত্রীর শিক্ষাগুণে পারুষ্য বা কর্কশভাব তাঁহার চরিত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছিল। তিনি শিশুদিগের সহিত সর্ব্বদা কোমল ব্যবহার করিতেন, তাহাদিগের নিকট কখনও কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিতেন না অথবা করিতে পারিতেন না। ইহার উপর আবার ওয়েনের কড়া হুকুম ছিল যে, তিনি কিছুতেই শিশুদিগকে বেত্রাঘাত প্রভৃতি কঠোর দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন না; এমন কি, বাক্যে বা কার্য্যে তাহাদিগকে কোনরূপ ভয়প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; এবং উগ্রভাবে কোনরূপ কর্কশ বাক্যও তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। সর্ব্বদা সহাস্যবদনে শিশুদিগের সহিত আলাপাদি করিতে হইবে, সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে হইবে, সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সুমিষ্টস্বরে কথা বলিতে হইবে। তিনি শিশুদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিবেন যে, তাহারা যেন তাহাদের অমায়িক ব্যবহার-দ্বারা সকল সময় তাহাদের সমপাঠী ও ক্রীড়ার সঙ্গীদিগকে সন্তুষ্ট ও সুখী করিতে পারে। রবার্ট ওয়েনের এই সকল উপদেশ-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া অচিরকালমধ্যে তিনি শিশুদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিলেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিশুর শিক্ষারও একটা বিশিষ্ট প্রণালী আছে এবং শিক্ষকের নিপুণতার উপর উহার সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাদের দেশের কত শিশুর ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দরিদ্র নিরক্ষর কৃষককুলের অথবা শ্রমজীবিগণের শিশুসন্তানের শিক্ষার কথা আমাদের দেশে এ-পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হইয়াছে কি না জানি না, অথবা উদয় হইয়া থাকিলেও তাহা হৃদয়েই বিলীন হইয়া আছে। যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা নব্বই জন, সে দেশে তিন বৎসর, চারি বৎসর বা পাঁচ বৎসরের শিশুর শিক্ষার কথা আবার কে ভাবিবে? শিশুর শিক্ষা-বিষয়ে

উদাসীন থাকা অশিক্ষিত মাতাপিতার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এ-বিষয়ে শিক্ষিত জনক-জননীর ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। শিশুর শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজসন্তানের নিকট, সমাজের নিকট ও ভগবানের নিকট পাপভাগী হইতেছেন। দায়িত্বহীনের ন্যায় শুধু বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে জীব-বৃদ্ধি করিয়াই যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, তবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে প্রভেদ রহিল কোথায়? শিক্ষিত পিতা হয় ত এই বলিয়া কলঙ্ক-অপনোদনের চেষ্টা করিবেন যে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে তাঁহাকে দিবারাত্র এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করা, তাঁহার পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও অসম্ভব। কিন্তু বঙ্গের শিক্ষিতা * জননী কি বলিয়া তাঁহার দোষ স্খালন করিবেন? তিনি সর্ব্বদা অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে গৃহে বিরাজমানা। শিশুসন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা কি তাঁহার গৃহকর্ত্তব্যের অন্যতম নয়?

শিশুকে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইলে যে-সকল গুণের প্রয়োজন বঙ্গজননীর হৃদয়ে উহাদের কোনটিরই অভাব নাই। বঙ্গজননীর ন্যায় স্নেহশীলা জননী আর কোথায় আছে? সন্তানের জন্য কোথায় কে এমনভাবে অম্লান-বদনে স্বীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে? তাঁহারা ধৈর্য্যে ধরিত্রীসমা। শিশুসন্তানকে শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ ভালবাসা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাঁহাদের হৃদয়গুলি তাহারই উৎস-ভূমি। তবে বঙ্গজননী শিশুর শিক্ষাবিষয়ে এত উদাসীন কেন?

হে বঙ্গজননীগণ! তোমরা একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতিগণ অপোগণ্ড শিশুদের শিক্ষার জন্য কতরূপ আয়োজন করিতেছে, শিশুদিগকে শিক্ষাপ্রদানের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী-সম্বন্ধে তাঁহারা দিন দিন কিরূপ নব নব তথ্যের উদ্ভাবন করিতেছে; শিশুর হৃদয়ে শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়া কিরূপে তাঁহারা উহার উন্মেষ ও বৃদ্ধিসাধন করিতেছে; দূরে দাঁড়াইয়া শিশুর স্বাধীনবৃত্তি-বিকাশের পথে তাঁহারা কিরূপ সাহায্য করিতেছে; আর তোমাদের ভালবাসার অত্যাচারে শিশুদিগের ক্রমবর্দ্ধনশীল আত্মা ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত হইয়া কিরূপে তাহার সহজ ধর্ম্ম হারাইতে বসিয়াছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

* শিক্ষিতা অর্থে এস্থলে উপাধিধারিণী বা স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তা নহে। যে কোনও রমণী, যিনি মাতৃগুণবিভূষিতা, হিতাহিত-বিবেকশালিনী, যাঁহার প্রকৃতই হৃদয়, মন ও আত্মার শিক্ষা হইয়াছে, কোনও বিদ্যাভবনে অধ্যয়ন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটুক আর নাই ঘটুক, তিনিই এ-স্থলে যথার্থ শিক্ষিতাপদবাচ্যা।

প্রস্ফুটন।

আমার অন্ধ আঁখি দেছ ফুটায়ে
কোমল কর পরশে!
রুদ্ধ আমার হৃদয় দুয়ার
খুলিয়া গিয়াছে হরষে!

নয়ন আমার বিভোর হ'য়ে
তোমারি-পানে চাহিছে;
হৃদয়-বীণায় তোমার সুরে
তোমার গীতি গাহিছে!

হৃদয়ের যত কোমল বৃত্তি
পড়িয়া ছিল নীরসে,
নূতন করে বাঁচিছে তাহারা
ডুবিয়া সুধা-সরসে।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

প্রার্থনা।

তোমার পুণ্য পরশে মোর,
ভেঙ্গে যাক্ জীবনের ভুল ;
ভ'রে যাক্ হৃদয়ের মাঝে
তোমার ও সৌন্দর্য্য অতুল !
যদি সংসারের ধূলি-খেলা নিয়ে,
ভুলে যাই তোমার বারতা,
দিও তবে স্মরণ করায়ে
হে আমার জীবন-দেবতা !

দৈন্যে যদি আসে অবসাদ,
ক্ষীণ দেহ ঘেরিয়া আমার,
বরষিও করুণার ধারা,
দিও শক্তি করিয়া সঞ্চার !
যবে, নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে
বিদীর্ণ হইবে মম চিত,
ডেকে নিও চরণের তলে
হে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত !

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী।

আমাদের আধুনিক সমাজ-সম্বন্ধে দু'টী কথা।

আমার প্রথম কথা—আধুনিক হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে শাসনের কি সম্বন্ধ সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা। "শাসন"-শব্দে এখানে আমি সমাজ বা মণ্ডলীর শাসনের উপর তত জোর না দিয়ে আত্ম-শাসনের কথাই বেশী করে বল্‌ছি। আত্ম-শাসনের অন্য নাম "আত্ম-সংযম"। এক কথায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, ভারতবর্ষ বিশেষভাবে সংযমের দেশ। বাক্যে কার্য্যে চিন্তায়—আহারে পরিচ্ছদে, সকল বিষয়েই এই সংযমের রাজত্ব। এখানে একাহারী, অনাহারী, ঊর্দ্ধবাহু, পঞ্চতপা—সংযমের কত বিভিন্ন মূর্ত্তিই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! সাধন বিষয়ে যদি ভারতের বিশিষ্ট কোন বাণী থাকে, তবে সে—সংযম। ভারত-সমাজ-সৌধের শীর্ষ-স্থানীয় যিনি সেই ব্রাহ্মণের আত্মসংযম ভুবন-বিখ্যাত এবং জগতের বিস্ময়ের বস্তু। সমাজের কল্যাণ-কামনায় ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্বীর ব্রত সাধন ক'রে গেছেন। রাজশক্তি ব্রহ্মণ্য-শক্তির দৈহিক অভাব পূরণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ;—ব্রহ্মবিদ্ তপস্বীও আপনার গৌরব-জনক অধিকারের কখনও অপব্যবহার করেন্ নি ; যতটুকু হলে রক্তমাংসের দাবী-দাওয়া মেটে, শুধু সেইটুকুই নিয়েছেন, তদতিরিক্ত অর্থে কখনও তিনি লোভ করেন নি। যদি কেহ নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে এমন অর্থ কখনও দান করেছেন, তবে সে অর্থ তিনি সমাজ-সেবাতেই নিয়োগ ক'রেছেন। আর্থিক দৈন্যকে তিনি কখনও অপমান বা পরিতাপের বিষয় মনে

করেন নি। যে চিত্ত, যে সম্পদ্ তিনি সাধনার বলে অন্তরে সঞ্চয় ক'রেছিলেন,তার কাছে সাত রাজার ধনও যে অতিতুচ্ছ—অতিনগণ্য! আসল ধনীর দীনতা কি কখনও লজ্জার কথা হয়? নকল ধনীরই "পাণ হ'তে চূণ খ'স্লে" ভাব্‌নার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। আসল ধনীর দৈন্যে রিক্ততা নাই—পূর্ণতা আছে, লজ্জা নাই,—গৌরব আছে। ব্রাহ্মণের এই দীনতার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কত নৃপতির প্রভুত্ব সসম্মানে মাথা নত ক'রেছে,—এর চরণতলে কত মুকুট লুণ্ঠিত হ'য়ে গেছে। আত্ম- ও স্বার্থ-ত্যাগে তিনি যে জগৎকে জয় ক'রেছিলেন, তাই তাঁর দীনতা এত শ্লাঘ্য, এত বরণীয়! বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-কামনায় রাজার ছেলের সিংহাসন-ত্যাগ ও পথের ভিখারী হওয়ার দৃষ্টান্ত, আর যেখানেই হোক, ভারতবর্ষে বিরল নয়। আবার ভারতের দেবতা সেই ভোলা মহেশ্বরের কথা ভাবুন্। দিগম্বর বা বাঘছাল-পরিহিত শ্মশানবাসী,—সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপন,—গলে হাড়মালা,—শিরে জটাজূট, ফণি-মালা-জড়িত কণ্ঠে হলাহল,—হস্তে ত্রিশূল;—ভূতপ্রেত তাঁর সঙ্গী। জগতের যত হেয় অবজ্ঞেয় তুচ্ছ পদার্থ তাঁর সহায়—তাঁর অঙ্গের ভূষণ—তাঁর আদরের বস্তু! এমন নিঃস্ব দেবতা আর কে? কিন্তু এমন মহান্, এমন প্রতাপান্বিত,এমন বিপদ্‌ভয়হারী, এমন ঐশ্বর্য্যশালী, এমন তেজোদীপ্ত দেবতাই বা আর কে? এই নিঃস্ব ভিখারী দেবতার যে কত তেজ, তা সতীর দেহত্যাগের পর তাঁর সেই তাণ্ডব-নৃত্যে ও মদন-ভস্ম-ব্যাপারে বিশ্বের সম্মুখে অতিশয় উজ্জ্বলভাবে প্রতিপন্ন হ'য়ে গেছে। যখন এমন বিপদ্ উপস্থিত যে, আর কোন দেবতাই তাতে কূল-কিনারা পেলেন না,—তখন এই ভিখারীর ডাক প'ড়েছিল।—তিনিও অপরকে সুধা দিয়ে নিজে বিষটুকু পান ক'রে ভক্তের হৃদয়াসনে চির দিনের জন্য সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে ব'সেছেন। তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্বের অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা তাঁরই ঘরণী। ভারতের দেবাদর্শের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে আমরা সংযমের বহুল দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই। পরার্থে স্বার্থত্যাগ ভারতের মঙ্গল আদর্শ!

আমি ভারতের কথা বিশেষ ক'রে বল্লাম, কিন্তু জগতের সকল ধার্ম্মিকের মধ্যেই এই সংযমের ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের পথে বিলাসিতা-ত্যাগ—শারীরিক আরামের সংক্ষেপ-সাধন—সকল দেশের ও ধর্ম্মের সমাদৃত সাধন-প্রণালী। ছাত্র-শিক্ষার সংস্কার-প্রয়াসী মনীষিগণও এই প্রণালীর সমর্থক। ভারতে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্যবস্থা,এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক জন লক্ এই ব্রহ্মচর্য্যের (Hardening System) এর দৃঢ় সমর্থনকারী। এমনই Milton, Rousseau, Arnold প্রভৃতি। বিলাসিতার লীলা-নিকেতন ও ইন্দ্রের অমরাবতীসন্নিভ আমেরিকার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত James সাহেবও এই নীতির বিশিষ্ট পোষক। তিনি বলেন—প্রতিদিন কোন না কোন বিষয়ে স্বেচ্ছাকৃত ক্লেশ ভোগ চরিত্রের দৃঢ়তা-সম্পাদনে অত্যন্ত অনুকূল। ছাত্রদের জ্ঞানার্জ্জন-রাজ্যেও তিনি সুকোমল "ফুল-শয্যার নীতি"র সমর্থন করেন না! তিনি বলেন—ছাত্রগণ ক্লেশ-স্বীকারপূর্ব্বক সংযমব্রত অবলম্বন ক'রে যদি জ্ঞান উপার্জ্জন না করে, তবে সে "বাবুয়ানী

জ্ঞানে" চরিত্রের মঙ্গল হয় না। এ-বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

এখন কথা এই,—ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সাধনের পছায় বিলাসিতা প্রবেশ ক'র্‌ছে কি না—সে-বিষয় ভেবে দেখ্‌তে হবে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজের সঙ্গে একটু তুলনা করা যাক্। হিন্দুশাস্ত্র-মতে গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কেন? কারণ, এইটী বিশেষ ক'রে সেবার আশ্রম। সেবা মানেই ত স্বার্থত্যাগ—"সংযম"। নিজের ষোল আনা সুবিধা বজায় রেখে জগতে কে সেবা ক'র্‌তে পেরেছে? হিন্দু গৃহীর প্রধান কর্ত্তব্য—অতিথি-সেবা। অতিথি দেবতাস্বরূপ।—তাঁর সেবা না কর্‌লে গৃহীর মহাপাপ। যে সংসারে অতিথি বিমুখ হয়, সে সংসার অভিশপ্ত। হিন্দুর ধর্ম্মাদর্শে এই অতিথি-সেবার দৃষ্টান্ত বহুল-পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মুদ্গল ঋষি সপরিবারে উপবাসী থেকে হাস্তমুখে অতিথি দুর্ব্বাসার সেবা করেছেন,—দাতাকর্ণ পুত্রের জীবন বলি দিয়েও অতিথির পূজা ক'রেছেন। এ হ'তে আর বেশী কি আশা করা যায়? হিন্দুগৃহের যিনি গৃহিণী তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অতিথির আগমন প্রতীক্ষা না ক'রে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত কর্‌বার অধিকারিণী ন'ন্। তারপর দাস-দাসীর সেবা। এই কিছুকাল পূর্ব্বে ভৃত্যদিগকে পরিবারেরই লোক মনে করা হ'ত;—উচ্চ-নীচের সীমা-রেখা তখনও এত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নি। পুরাতন ভৃত্য সংসারে মাননীয় বয়স্ক অভিভাবক-রূপেই বিবেচিত হ'ত;—গৃহস্থালীর, অন্ততঃ রন্ধন-শালার, বিধি-ব্যবস্থা তাহাদের রুচি ও ইচ্ছার দ্বারা অনেক পরিমাণেই নিয়ন্ত্রিত হ'ত। অনেক পরিবারে ভৃত্য কৃষিকার্য্যে যাবার পূর্ব্বে বাড়ীর বউদের ব'লে যেত, সে-দিন কি রান্না হবে।—বউদের সাধ্য-ছিল না সে-ব্যবস্থা উল্টে অন্য কিছু কর্‌বার। এ-সব ব্যাপারে সংযমের ভাবই সুস্পষ্ট। তারপর গৃহবিগ্রহের পূজা ও সেবার ব্যবস্থা। সে ব্যাপারে কত নিষ্ঠা, কত সংযম! ভোরে উঠেই শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ক'রে বিগ্রহের পূজার জন্য দূর্ব্বা-পুষ্প-বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ কর্‌বার ব্যবস্থা। কি শীত, কি বর্ষা কোন ঋতুতেই তার ঈষৎ ত্রুটী হবার যো নেই। যতক্ষণ বিগ্রহের সেবা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহিণীর অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ। যদি কোন কারণে পূজক ব্রাহ্মণ যথাকালে পূজার সময় উপস্থিত হ'তে না পারেন, তা হ'লে গৃহীকে অন্য ব্রাহ্মণ সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে;—যদি গ্রামে উপযাসী ব্রাহ্মণ না মেলে, তবে গ্রামান্তর হ'তে পূজক সংগ্রহ কর্‌তে হবে। ফলকথা, দেব-পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহে আর স্বস্তি নাই। তা ছাড়া, হিন্দুগৃহের "বার মাসের তেরো পার্ব্বনের" কথা ভাবুন। পূর্ণ উপবাস বা অর্দ্ধ উপবাস তো প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! এমন কি, গৃহের বালক-বালিকাদেরও অনেক ব্রত-নিয়ম উপলক্ষে অনেক উপবাসের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হত। প্রাচীন আদর্শ হিন্দু-পরিবারে এইরূপে আমারা দেখ্‌তে পাই যে অনেক কার্য্যেই একটী শান্ত সংযমের ভাব প্রস্ফুট ছিল। এখন ভাবুবার বিষয়, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পরিবারে কোন্ কার্য্যে কতটুকু সংযমের ব্যবস্থা আছে। আমি যখন সংযমের ভাব বল্‌ছি,—তখন একটা স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক কোমল বিনম্র ক্লেশ-সহিষ্ণুতার কথাই বলছি। সেইটুকুই শুভ ও শোভনীয়।

—শুষ্ক-নিয়ম-পালন কখনই শুভের নিদান হ'তে পারে না। আহারে পরিচ্ছদেও এই সংযমসাধনের যথেষ্ট অবসর আছে। পরিচ্ছন্ন বা সুরুচি-সঙ্গত পরিচ্ছদ-পরিধান এক কথা, আর পরিচ্ছদের পারিপাট্য মনকে তমোভাবে পূর্ণ ক'রে চলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এ-কথা সত্য যে, ছিন্নকন্থার ভেতর দিয়েও অনেক সময় অহঙ্কার উঁকি মারে;—তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ছিন্নকন্থার দর্পনিবারক-শক্তি বেশ একটু যথেষ্ট পরিমাণেই আছে;—সুতরাং ওরূপ অহঙ্কারের উঁকিকে আমরা নিয়মের বার ব'লেই ধ'রে নিতে পারি। বেশী ভয় জমকালো পোষাককেই। এখানে তর্ক তোলা যেতে পারে—'কেন? পোষাক জমকাল হ'লেই মনের ভাব গরম হয়ে উঠ্‌বে কেন?' যুক্তি বা তর্ক-শাস্ত্রের কোন নিয়মের উল্লেখ ক'রে এ 'কেন'র সন্তোষ-জনক উত্তর দেওয়া যায় না। এখানে আমার একটী গল্প মনে পড়্‌ল। এই ক'ল্‌কাতারই এক বন্ধু আমাকে এই গল্পটী ব'লেছিলেন।—একজন সব্‌ডেপুটী —নতুন চাকরী তাঁর—তর্ক বিষয়ে বেশ পটু। কার্য্যোপলক্ষে তিনি এক রাত্রে এমন জায়গায় গিয়েছিলেন, যেখানে ভাল আহারের ব্যবস্থা অসম্ভব। সংবাদ নিয়ে তিনি জান্‌লেন— সেখানে খাঁটি দুধ ও মুরগীর ডিম যথেষ্ট মেলে। চাকরকে দিয়ে ⁄২ সের দুধ ও আটটী ডিম আনালেন। খেতে উদ্যত—এমন সময় তাঁর এক বন্ধু বল্লেন,—'অতটা দুধের উপর ৮টা ডিম খাবেন না। গরম হবে।' হাকিম বল্লেন— 'কুসংস্কার! গরম কি?—কেন হবে?' বন্ধু বল্লেন—"হয়, শুনেছি।" হাকিম আহার শেষ ক'র্‌লেন। রাত্রি ১২টার সময় দেখা গেল, হাকিম-পুঙ্গব গায়ের সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে, তাঁর কৃষ্ণকায় বিশালবপুঃ খানিতে দুহাতের দু'খানি পাখা দিয়ে বাতাস ক'রছেন, আর সবেগে ইতস্ততঃ পায়চারী করছেন। দৃশ্যটী বেশ নাটকীয় ধরণেরই হ'য়েছিল;—কল্পনার চক্ষে তাই মনে হচ্ছে। সেই বন্ধু তাঁর 'কেন'র উত্তর দিতে পারেন নি —কিন্তু অভিজ্ঞতা বেশ সদুত্তরই দান ক'রেছিল। এ-কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎকালে হাকিমের ডিমভক্ষণ একবারে লুপ্ত না হ'লেও, বেশ একটু সংযত হ'য়ে এসেছিল। অভিজ্ঞতায় ব'লে—পরিচ্ছদের বিলাসিতা মনের বিলাসিতার পরিপোষক। বুট, প্যাণ্ট, কোট, টাই, হ্যাট—এতে কিছু বাঙ্গালীর জন্মে অহঙ্কার মাখান থাকে না;—কিন্তু এ-গুলি দেহে উঠ্‌লেই অনেক বাঙ্গালীর পা-দুটী কেন যে স্বতঃই ফাঁক হয়ে পড়ে—কেন যে দেহযষ্টি বেশ একটু কায়দামত দুলে উঠে—কেন যে অশ্বযানের চালকের পৃষ্ঠে দুই ঘা চাবুক বসাতে, ট্রেণ আরোহীকে ঘুঁসি মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়, তার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। খাদ্য-সম্বন্ধেও ঐ কথা। স্থলবিশেষে মাংসাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হ'তে পারে—সুতরাং মাংস-ভক্ষণ থাকুক্। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে, হালশিক্ষিত গৃহীগণ বাড়ীতেই হাঁস বা মুরগী পোষণ করেন, আর প্রতিদিন তাঁদের বাড়ীতেই পক্ষীদের হত্যা করা হয়। অনেক সময় গৃহের বালকবালিকাদের সম্মুখেই হত্যাকার্য্য সাধিত হ'য়ে থাকে।—আর ছেলেরা তাতে স্বাভাবিক-ভাবেই কৌতুক অনুভব করে। এখানে কি একটু সংযম চলে না?

চক্ষে দেখি নি, কিন্তু গল্প শুনেছি, এই বিংশ-শতাব্দীর কোন কোন অতিসভ্যতাভিমানিনী মহিলাও নাকি খানার টেবিলে ব'সে ভারত-রমণীর অস্পৃশ্য আহার্য্য-পানীয়াদি গ্রহণ করেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ইচ্ছে হয়—এটা কি ভারতীয় নারীদের গৌরব-বর্দ্ধক—না তা'র কুসুমপেলব সুকুমার বুকে মর্ম্মান্তিক শক্তিশেল নিঃক্ষেপ? কথাটা এতই বীভৎস যে এটা আমি এ-পর্য্যন্ত অবিশ্বাস ক'রেই এসেছি।—ভগবান্ করুন্, এ দৃশ্য যেন কখনও চক্ষে দেখ্‌তে না হয়।

আমার দ্বিতীয় কথা—আধুনিক সমাজে আন্তরিক স্নেহ প্রীতি ও হৃদ্যতার স্থলে একটা নীরস লৌকিকতা ও প্রাণহীন আদব-কায়দার ভাব প্রবেশ ক'র্‌ছে কি-না, সেই বিষয়ের আলোচনা। অনেকে মুখে প্রীতিকে পরম সাধন ব'লে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রীতির ধারণাটা ঠিক্ সুস্পষ্ট কি-না সেইটাই বিচার্য্য বিষয়। এখানে প্রীতির সঙ্গে আর একটা মনোভাবের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।—কারণ, অনেক সময় এ দুটীকে মিশিয়ে ফেলা হয়—একটাকে অপরটী ব'লে ভ্রম হয়। সেই আর একটা বৃত্তির নাম—অনুগ্রহ, অনুকম্পা বা দয়া। এই অনুকম্পা কখনই প্রীতি নয়। ঈশা ব'লেছেন, 'যদি তোমার সকল সম্পত্তি গরীবকে দান কর অথচ প্রীতি না থাকে, তবে সে দান একান্তই নিষ্ফল। এই উক্তিতে এই পার্থক্য অতি-বিশদ ভাবেই উল্লিখিত হ'য়েছে। দান দয়ার কার্য্য—অনুগ্রহ বা অনুকম্পার কার্য্য; কিন্তু প্রীতিশূন্য সর্ব্বস্বদানও ঈশার মতে একান্ত নিষ্ফল। তবে প্রীতি কিরূপ ভাব? প্রীতির সঙ্গে সহানুভূতিও দীনতার ভাব অনুস্যূত। পরমহংস দেবের সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। কোন সময় তিনি অনাহারে ছিলেন।—তিনি কিছুই খান নি দেখে, তাঁর এক শিষ্য তাঁকে বল্লেন—'আপনি কিছু খান।' শিষ্য বারংবার অনুরোধ করায় তিনি নিজের মুখ দেখিয়ে বলেছিলেন—"কেন এই মুখ দিয়ে না খেলে কি আর খাওয়া হ'ল না? আমি তো সহস্র মুখে আহার করেছি।—দেশে যে যে খেয়েছে তার মুখ দিয়েই আহার করেছি।—তাতে কি খাওয়া হয় নি?"—এইটী আসল প্রীতির ভাব। কি জীবন্ত সহানুভূতি!—সমস্ত মানুষের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করা—সমস্ত মানুষের অবস্থাকে আপনার ক'রে নেওয়া! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যখন সপ্তরথি-কর্ত্তৃক অভিমন্যু নিহত হ'য়েছেন, তখন ভদ্রাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—"ভগ্নি, তোমার পুত্রের নিধনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমি; ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের পথে এই অভিমন্যুবধই আমার প্রধান উপায় ছিল।" ভদ্রা বল্লেন—'ভাই, সে-জন্য দুঃখ কি? তোমার ইচ্ছাই আমার যথেষ্ট। আমি আজ জগতের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি—আমার এক অভিমন্যু সহস্র অভিমন্যু হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌ছে,—আজ আমি এক অভিমন্যু হারিয়ে লক্ষ অভিমন্যু লাভ ক'রেছি।" কি গভীর সহানুভূতি! এর নামই "প্রীতি"। প্রীতি আপনাকে দিয়ে অন্যকে ধন্য করে না,—সে আপনাকে দিয়ে আপনিই ধন্য হয়। সে চিরদীন—দর্প তা'র ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। জগতে এমন মধুর দর্পহারী আর কিছু আছে কি না, জানি না। আর একবার সেই উশীনর রাজার কথা ভাবুন।—রাজা

যজ্ঞানুষ্ঠানে রত; এমন সময় একটা কপোত একটা শ্যেন-ভয়ে ভীত ও শরণার্থী হ'য়ে উশীনর-নৃপতির উরুদেশে লুক্কায়িত হ'ল। শ্যেন বল্ল—"রাজন্, আমার ভক্ষ্য কপোতকে ছেড়ে দিন্; ক্ষুধার্ত্তের আহার-হরণ-জন্য ঘোর পাপে লিপ্ত হ'বেন না।" রাজা বল্লেন—"শ্যেন, কপোত তোমার ভয়ে ভীত হ'য়ে আমার শরণাগত; একে পরিত্যাগ না করাই পরম ধর্ম্ম।" শ্যেন বল্ল—"আমি একান্ত ক্ষুধাতুর এ আহার না পেলে আমার মৃত্যু ঘট্‌বে—আমার মৃত্যুতে আমার পরিবারবর্গও বিনষ্ট হবে। একটী প্রাণীর রক্ষার জন্য বহু প্রাণীর সংহারে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্ম নয়।" রাজা বল্লেন—"হে শ্যেন, আহারই তোমার প্রয়োজন?—আমি তোমাকে আহার দেব।" শ্যেন বল্লে—"কপোত ছাড়া আমি আর কিছু খাই না।" রাজা বল্লেন—"আমি কপোতকে ছাড়্‌তে পারি না;—তুমি কি কর্‌লে সন্তুষ্ট হয়ে এই কপোত পরিত্যাগ ক'র্‌তে সম্মত হও তাই বল। আমি তা সম্পন্ন কর্‌ব।" শ্যেন বল্লে—"তুমি যদি কপোতভারের সমতুল আত্ম-মাংস কর্ত্তন করে আমায় দাও, তবে আমি পরিতুষ্ট হতে পারি।" রাজা সানন্দে সম্মত হ'লেন। দেবতার পরীক্ষা!! রাজা শরীর হ'তে যতই মাংস কর্ত্তন করেন, কিছুতেই ওজনে সেই ক্ষুদ্র কপোতের সমান হয় না! শ্যেন ভাবল—'এইবার! দেখি তোমার কপোত-প্রীতি কত প্রবল।' কিন্তু উশীনর কি ক'র্‌লেন?—আর মাংস কর্ত্তন না ক'রে অম্লানবদনে স্বয়ং সেই তুলাদণ্ডতে আরোহণ ক'রলেন! স্বর্গে দুন্দুভি বাজ্‌লো—পরীক্ষার শেষ হ'ল; প্রীতির কীর্ত্তি পুণ্যলোকে অক্ষয় হ'য়ে থাকল। একেই বলে শুদ্ধ প্রীতি।

দেশ এখন যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। Working man's Institute, Depressed Class mission, Village organiers প্রভৃতি অনেক হিতকর অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায়। আমার এখানে একটী কথা শুধু জিজ্ঞাস্য আছে। হে দেশের যুবক বন্ধুগণ, দুঃখ-অজ্ঞানতা-কুসংস্কার-রূপী শ্যেন ঐ নিরাশ্রয় অভাবপীড়িত শ্রমজীবি-রূপ কপোতের প্রাণ-সংহারে উদ্যত হয়েছে দেখে তোমরা কপোতকে আশ্রয় দিয়েছ। অতিশয় পুণ্যকার্য্যে তোমরা ব্রতী। কিন্তু পরীক্ষাও বড় ভীষণ! রক্ত-মাংসেই হয়তো যথেষ্ট হবে না; তুলাদণ্ডে প্রাণটী পর্য্যন্ত তোল্‌বার প্রয়োজন হতে পারে। এ যে যথার্থই অগ্নি-পরীক্ষা, বজ্রের পরীক্ষা। তখন পারবে কি ঐ উশীনরের মত অম্লান-বদনে শরণাগতের রক্ষার জন্য প্রাণ সমর্পণ কর্‌তে? আমি বলি, "পারবে, যদি তোমাদের এ কার্য্যের পশ্চাতে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা না থেকে, থাকে হৃদয়ের শুদ্ধ প্রীতি। এ প্রীতি মৃত্যুঞ্জয়ী, এ মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে। যখন প্রীতি এসে প্রাণ অধিকার করে, তখন জগৎ আমিময় হয়ে যায়, তখন কেউ আর পর থাকে না; সকলের ভেতরে আমিকেই দেখতে পাওয়া যায়। যখন উপবাসী অনাহারে কাঁদে, তখন দেখি, সে যে আমিই কাঁদ্‌ছি! তার ক্ষুধাতে আমিই পীড়িত হয়ে উঠি। যখন প্রীতি এসে হৃদয়কে অধিকার করেন, তখন জগৎ ব্রহ্মময় হয়ে যায়। পীড়িতের ব্যথিতের ভিতরে যে স্বয়ং শ্রীহরি আমাদের সেবা ভিক্ষা কর্‌ছেন! কে এমন পাষাণ-হৃদয় আছে যে, প্রিয়তমের

সে আহ্বান উপেক্ষা ক'র্‌তে পারে? সে আহ্বান উপেক্ষা করে নিজে উপাদেয় অন্ন ভোজন করবে? হা ধিক্! সে অন্নে যে জীবনী-শক্তি থাক্‌বে না, তা'তে যে মৃত্যু বহন করে আন্‌বে। প্রীতির স্বভাব এই, সে সকলকে নিয়ে আপনাকে পূর্ণ ক'রে তুল্‌তে চায়। সে জানে একটিকে ছাড়্‌লেও তার মুক্তি নেই। Bible এর সেই দলভ্রষ্ট মেষের কথা ভাবুন্। সে মেষটিকে খুজে আন্‌তেই হবে; সে দলের মধ্যে না এলে, দলের জন্য পরিত্রাণের দুয়ার যে একেবারে বন্ধ। এখন ভেবে দেখতে হবে, আমরা এই অর্থে প্রীতিকে "পরম সাধন বলে মান্‌ছি কি না।

আমার নিজের ধারণা, অনেক স্থলে যেন আন্তরিক হৃদ্যতার পরিবর্ত্তে একটা সুভদ্র সৌজন্যই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকদের অবস্থা কি তা প্রায় সকলেরই জানা আছে,—উচ্চ জ্ঞানের আলোক নেই, বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মন;—অনেকে আবার কলহপটু—মুখরা। সুতরাং এঁদের হৃদয় আকর্ষণ করবার কোন গুণ আছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু কি জানি কেন—হৃদয় যে আকৃষ্ট হয়! বিদেশে প্রবাসের পর জন্মপল্লীতে ফিরে গিয়ে প্রতিবেশিনী গ্রাম-সম্পর্কে জেঠাইমাকে প্রণাম করে, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে গেছি—হয়তো দেখলাম জেঠাই-মা তখন রান্নাঘরে গোবরজলে মেঝে নিকুচ্ছেন—কিম্বা গোয়াল-ঘর পরিষ্কার কর্‌ছেন, কিম্বা মুড়ি ভাজ্‌তে বসেছেন। যেমন গিয়ে সাম্‌নে দাঁড়ান—অম্নি কি এক আন্তরিক স্নেহের স্বরে, কি ব্যস্ততার সঙ্গে—কত বড় আগ্রহে জেঠাই-মা বল্লেন—"কে বাবা! কখন্ এসেছিস্। আয় বাবা বোস্ বোস্; দাঁড়া হাতটা ধুয়ে আসি! বাবা ছোট কাপড় পরে রয়েছি!—ও মা শৈল, তোর দাদাকে আসনটা পেতে দে—দাদাকে পেন্নাম কর্।" তার পর গোবর-হাত ধুয়ে জেঠাইমা যখন বড় কাপড় পরে দাঁড়ালেন—আর আমি তাঁকে প্রণাম কল্লাম,—তখন কি একটা গভীর মমতায় চিবুকে হস্ত সংস্পর্শ করে, সেই হস্ত সস্নেহে চুম্বন ক'রে জেঠাই মা বল্লেন, —"বেঁচে থাক্ বাবা, দীর্ঘজীবী হয়ে ছেলে পুলেদের নিয়ে সুখে থাক্!—কবে তোদের সব রেখে আমরা যেতে পার্‌ব—তাই মনে ভয় হয়।"—জেঠাই-মার চক্ষু ছল ছল ক'রে উঠলো! বুঝি, সেই সময় নিজের প্রবাসী পুত্রটির মুখ চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো—! জেঠাই মা অঞ্চলে চোখ মুছ্‌লেন। তার পর বল্লেন—"বোস বাবা, ঘরে যে কিছু নেই!—আর এমন গাঁ, কিছু মেলবারও যো নেই! ও শৈল, ও বাড়ীর শশা-গাছ হ'তে সেই ভাল শশাটা তুলে আন্‌তো।" তার পর ঘর হ'তে মুড়ি ও গুড়—আর গাছ থেকে সেই শশাটি একত্র ক'রে একখানি ঝক্‌ঝকে রেকাবিতে পরম যত্নে সাজিয়ে জলখাবার খেতে দিলেন। জানিনা—এই সব কাযের মধ্যে কোথাও কিছু নূতনত্ব আছে কি না; কিন্তু এটা বেশ বুঝি যে, এর কোনখানে একটা যাদুমন্ত্র আছে—যা'তে হৃদয় মুগ্ধ হয়, —একটা চন্দনস্পর্শ আছে যাতে প্রাণ স্নিগ্ধ হয়,—একটা বসন্তের হিল্লোল আছে যাতে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়,—একটা চন্দ্রের আকর্ষণ আছে, যাতে হৃদয় নদীতে জোয়ার খেলে! জেঠাই-মায়ের অজ্ঞানতা, মুখরতা ও

কলহপ্রিয়তা কোথায় সরে দাঁড়ায়—থাকে একটী কোমল প্রাণের অম্লান মাধুর্য্য, একটী স্বর্গীয় স্নিগ্ধ স্নেহের সুর! এই এক দিক্। এটা হ'ল প্রাচীন সমাজের ছবি।

অন্য দিকের কথা একটু বলি। বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। পরিবারে সর্ব্বদা যাতায়াত আছে। কোন কার্য্য-উপলক্ষে কোন প্রতিবেশিনী মহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন। একেবারে বাড়ীতে প্রবেশ করা কায়দার বিরুদ্ধ। প্রথম চাকরকে অনুসন্ধান করতে হবে। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া চাকরের মর্জ্জি—কইতেও পারে, না-কইতেও পারে। যদি ভাগ্যবলে চাকরের দয়া লাভ করলে—তবে একখানি শ্লেটে কিংবা কাগজে তোমার নাম-ঠিকানা-পরিচয় লিখে দিতে হবে। ভৃত্য সেটী নিয়ে ভেতরে যাবে। তুমি ততক্ষণ যে-ভাবে পার অপেক্ষা কর। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তবে জবাব শীঘ্রই পেলে—নচেৎ এ অপেক্ষা প্রায়শঃই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। তোমার কাজ হয়তো ২ মিনিটের কিন্তু এর জন্যে তোমাকে এক ঘণ্টাও অপেক্ষা ক'রতে হ'তে পারে। তোমার নিজের কত কাজের ক্ষতি হতে পারে—তাতে কি? আদব-কায়দার কাছে ক্ষুদ্রের লাভ-লোকসানের হিসাব কে ক'রছে বল? তারপর সাক্ষাৎ করি। সেটা কি রকমের?—"নমস্কার"; প্রত্যভিবাদনে দুটি হাত কপালে তুলে—"নমস্কার। ভাল আছেন আপনারা?" "হাঁ; আপনারা ভাল আছেন?" বাস্, এইখানেই সম্ভাষণের যবনিকা। তার পর কাজের কথা। তারপরই প্রস্থান। বেশ ভদ্রোচিত কায়দা অনুসারেই সব কাজটা নিষ্পন্ন হল।—শীলতার দিক্ থেকে একেবারে নিখুঁৎ—পূর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের দিক্ থেকে—? আমি তো বলি একেবারে প্রকাণ্ড শূন্য। সংস্কৃত জ্ঞান, সভ্যতা, ভব্যতা, পরিচ্ছন্নতা—সবই যে ফাঁকি ব'লে মনে হয়! মৃতদেহে বহুমূল্য অলঙ্কার ধারণের ন্যায় এযে সর্ব্বথা নিরর্থক। সভ্যতার বাজারে এর খুব মূল্য থাকে থাকুক্—প্রীতির হাটে একে কেউ ছোঁবে না। এতে আনন্দের প্রমুক্ত উচ্ছ্বাস নেই—সুশীলতার আড়ষ্ট বন্ধন আছে। এতে মনোহরণের যাদু-মন্ত্র নেই—একে একান্তই শুষ্ক লৌকিকতা আছে! এতে প্রাণের উত্তাপ নেই—সৌজন্যের তুষারস্পর্শ আছে। এখন দেখ্তে হবে আধুনিক সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার হুজুগে কি এই প্রাণের বস্তুগুলিকে ছেড়ে দিতে বসেছেন? হোক্ না পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা—রাজার ছাপ-মোহর দেওয়া শিক্ষা। তা ব'লে কি ভারতে অমূল্য কাঞ্চনের বদলে বিদেশের ঝক্‌ঝকে কাচ কিন্‌তে হবে? ভারতনারী যদি প্রীতি, কোমলতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, পরার্থপরতার মূল্যে ইংরাজি, ল্যাটিন, গ্রীক্, ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান কেনেন—তাঁরা আধুনিক বিকৃত সমাজের বাহবা পেতে পারেন, রাজদরবারে তাঁদের সম্মান বাড়্‌তে পারে,—কিন্তু ধর্ম্মের দরবারে, চরিত্রের দরবারে তাঁরা একান্ত কাঙ্গালিনী হয়ে পড়্‌বেন। যদি অবস্থা এরকম হ'য়ে থাকে, তবে সাবধান হবার সময় এসেছে—আর উদাসীন থাকা কিছুতেই চল্‌বে না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য সাধন ক'রে শ্রেয়কে মস্তকে ধারণ কর্'তে না পার্‌লে প্রেয়ের দ্বারা প্রতারিত হ'তে হবেই হবে। প্রেয়ের যে মূল্য অবশ্যপ্রাপ্য তা

তাকে দিতেই হবে, সে-বিষয়ে কারো কিছু বল্‌বার নেই ; কিন্তু শ্রেয়ের মূল্যে প্রেয়কে বরণ ক'রে নেওয়া অতীব বিপজ্জনক ; এ বিপদ্ সমাজের সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

পরিশেষে বক্তব্য,—আমি নিজে শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী এবং সে শিক্ষা মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন ক'রেছে এবং এখনও খুব বেশী পরিমাণেই আমাদের এ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমার শুধু বক্তব্য এই—শিক্ষার নামে যেন আমরা কুশিক্ষাকে ঘরে ডেকে না আনি ; রাজার ছাপ মারা ব'লে "পাশ্চাত্ত্যে"র খাতির ক'রতে গিয়ে যেন "প্রাচী"র কল্যাণকর শিক্ষাকে জলাঞ্জলি না দিই। শিক্ষার ক্ষেত্রে 'খাতির' ও "গোঁড়ামি" উভয়ই তুল্যভাবে অনিষ্টকর। এই দুই স্রোতকে দূরে ব্যাহত রেখে মাঝখান দিয়ে তরী চালাতে হবে—নচেৎ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

নিবেদন।

ভিতরে দেখি নে তোমা, বাহিরে খুঁজিয়া মরি।
স্বরূপ পিছনে রাখি, ছায়ার দুয়রে ঘুরি।
আলোক থাকিতে কাছে,আঁধারের পানে ধাই,
সুপথ ফেলিয়া দূরে, কুপথ বহিয়া যাই।
তুমি যে অন্তরে আছ একবার নাহি ভাবি,
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে ভুলের চরণ সেবি।
সকলের কাছে গিয়া যাচি এক কণা শান্তি ;
বুঝিতে পারি না কিছু, এ মনের এ-কি ভ্রান্তি
তুমি যে অনন্ত সুখ শান্তির আশ্রয়-ভূমি,
সে কথা ভাবি না মনে ; বেড়াই জগৎ ভ্রমি।
ঘুচাও এ আঁখি-ঘোর জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি,
বন্ধন ঘুচায়ে কর তব শ্রীচরণ-সাথী।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আগমনী।

[রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

(মেনকার উক্তি।)

আলাহিয়া—একতালা।

বরষ পরে মারে কি আজ পড়্‌ল মনে পাষাণী।
কোন্ পাষাণে গড়া মা তোর কোমল হৃদি না জানি।
মায়ের প্রাণ বরষ ধরে, বুঝিস্ নে মা, কেমন করে,
গোপনে মোর নয়ন ঝরে একলা ঘরে ঈশানি।

ভাল মন্দ মুখে দিতে, চায় না মাগো তিলেক চিতে,
শিহরি' মন উঠে চকিতে স্মরিয়ে কচি মু'খানি !

'মা' বলে মা, ডাক্‌তে মোরে, বুক জুড়ায়ে বস্‌তে ক্রোড়ে,
কে আছে আর আমার ও রে ! জানিস্ না কি ভবানি ?

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
II { -া গা পপা। পধা -পধা না I র্সর্সা -নর্সা -ধা। পা পনা -গা।
০ ব রষ্‌ পং ০০ রে মায়ে ০০ ০ কি আং জ্‌

০ ১ ২´ ৩
। া ররা গা। মা -পা পা I মা -গা -মা। রা সা -া }।
০ পড়্‌ ল ম ০ নে পা ০ ০ ষা ণী ০

০ ১ ২´ ৩
। -া সসা সা। গা -মা মা I পা পা -া। পা -মা পপা।
০ কোন্‌ পা যা ০ ণে গ ড়া ০ মা ০ তোর্‌

০ ১ ২´ ৩
। া পা পপা। ধনা -ধনা র্সা I ধপা -মগা -মা। রা -সা -া II
০ কো মল্‌ অং ০০ দি নাজা ০০ ০ নি ০ ০

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II { -া পা পপা। ধনা -ধনা -র্সা I র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া।
০ মা য়ের্‌ প্রাং ০০ ণ্‌ ব র য্‌ ধ রে ০

০ ১ ২´ ৩
। -া র্সা র্গর্গা। র্রা র্গা -র্মা I র্গা র্মা -র্রা। র্গা র্সা -া }।
০ বু ঝিস্‌ নে মা ০ কে ম ন্‌ ক রে ০

০ ১ ২´ ৩
। -া পা পা। নধা -নর্সা র্সর্সা I না র্সা -া। ধা পা -া।
০ গো প নেং ০০ মোর্‌ ন য় ন্‌ ঝ রে ০

০ ১ ২´ ৩
। -া গগা মা। পা পা -া I মা -গা -মা। রা সা -া II
০ এক্‌ লা ঘ রে ০ ষ্ট ০ ০ শা নি ০

(১) ব্রহ্মার পূজা ও তাহার লোপ।

বৈদিকযুগে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া স্তুতিগান করিতেন; তাঁহারা চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, পর্জ্জন্য, অগ্নি ইত্যাদিতে দেবত্বারোপ করিয়া তাঁহাদেরই উপাসনা করিতেন; এমন কি, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু-পক্ষীতেও সময়ে সময়ে দেবত্বারোপ করিতেন। এইরূপ স্তুতিগানগুলিই ঋগ্বেদে সূক্ত বলিয়া পরিচিত এবং এক একটী কবিতা ঋক বলিয়া অভিহিত হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ-স্থলে আমরা প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে দেবতারূপে বড় দেখিতে পাই না; তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কাল্পনিক দেবতা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ এই মণ্ডলে ঋষিদিগের মধ্যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। নানাপ্রকার দেবতার সৃষ্টি কি করিয়া হইল, অর্থাৎ কে ইঁহাদের সৃষ্টি করিল?—ইহাই নির্ণয় করিবার প্রথমতঃ প্রধানতঃ ও চেষ্টা হয়। তাঁহারা দেবতাদিগের, মানুষের, ও যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গমের আদি কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রয়াসের ফলে ব্রহ্মন্, স্কম্ভ, বিশ্বকর্ম্মা, ব্রাহ্মণস্পতি, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি দেবতার সৃষ্টি হইল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই জগতের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, কিন্তু সকলের আদি কারণ যে এতগুলি দেবতা, ইহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি কাহার আছে? সেইজন্য ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী ঋষিরা এই সমস্ত দেবতাগুলিকে মিলাইয়া এক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দেবতারই কাজ বিভিন্ন ও গুণ বিভিন্ন। এই বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন গুণ ও কার্য্য লইয়া সেগুলি এক দেবতাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকেই তাঁহারা আদি-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ফলে উপনিষদে ব্রহ্মন্ (ক্লীং) বা পরমাত্মন্ সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এই শেষোক্ত চেষ্টার ফলেই ব্রহ্মারও উৎপত্তি।

ঋগ্বেদে "ব্রহ্মা" শব্দ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি দেবতারূপে তথায় আবির্ভূত হন নাই, হইয়াছিলেন ঋত্বিগ্‌রূপে। অনেকস্থলে তিনি দেবতাদের স্তুতি করেন, হোম করাই তাঁহার কাজ। সামবেদে ও যজুর্বেদে তাঁহার এইরূপই অবস্থা; তবে অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মা যজ্ঞের পরিদর্শনকারী ও নিয়ামক। অতএব তিনি মনুষ্য, দেবতা নহেন; সেইহেতু সৃষ্টির সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই।

আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতার অনেক নাম আছে, তাহার মধ্যে প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ও হিরণ্যগর্ভ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা; তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মার কোন সম্বন্ধ ছিল না। (১) প্রজাপতি ঋগ্বেদের প্রাচীন ভাগে সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতেন, কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ভিন্ন দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। "প্রজা" অর্থাৎ মনুষ্যাদির উৎপত্তিই তাঁহার প্রধান কাজ। (২) ঋগ্বেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের বিশেষণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ১০ম মণ্ডলে তিনি বৈদিক দেবমণ্ডলে স্থান পান। তথায় দেখিতে পাই

তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার চারিদিকে চোখ, মুখ, হাত, পা আছে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার ডানা আছে। যখন স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি তৈয়ারী করা শেষ হইয়া যায়, তখন তিনি তাহা হাত ও ডানার সাহায্যে ঠেলিয়া দিয়া ঘুরাইয়া দেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি দেবতাদিগের নাম দিয়াছেন। তাঁহাকে কোন মনুষ্য কল্পনা করিতে পারে না। (৩) দশম মণ্ডলে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, 'হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি স্বর্গমর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি প্রাণ ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ দেবতারাও অমান্য করেন্ না। তিনি দেবতাদিগেরও দেবতা।'

প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ও হিরণ্যগর্ভের গুণ ও কাজ শেষ উপনিষদ্‌যুগে ব্রহ্মার ঘাড়ে চাপিল। উপনিষদ্‌গুলি প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মাকে লইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া ফেলিলেন। কখনও দেখি যিনিই হিরণ্যগর্ভ তিনিই ব্রহ্মা, কখনও দেখি যিনিই বিশ্বকর্ম্মা তিনিই ব্রহ্মা বা প্রজাপতি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা হইলে উপনিষদ্ হইতে বুঝা গেল, ব্রহ্মাই মনুষ্যাদির উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনিই তাহাদের প্রাণ ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দিয়াছেন; সৃষ্টির আদিতে তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন, স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছেন্। তাঁহার চতুর্দ্দিকে হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদি আছে। তিনি সর্ব্বদর্শী। বিশ্বকর্ম্মার যে ডানা ছিল, সে-ডানা কেন ব্রহ্মাকে দেওয়া হইল না, সে-বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, এই ডানার পরিবর্ত্তে পরে তাঁহাকে ডানাসংযুক্ত হংসবাহন দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্রহ্মা কিন্তু উপনিষদে আদিকারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হ'ন্ নাই, তাঁহারও সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ব্রহ্মন্ (ক্লীং)।

বৈদিকযুগের অনেক দেবতার গুণগ্রাম একত্র করিয়া কিরূপে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল। তাহা ইতিহাসের দিক্ দিয়া পূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার পূজা-সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে বিষ্ণু ও শিবের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিলে অসম্পূর্ণতা-দোষ ঘটে। খাঁটি ব্রহ্মার কথা শুনিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ ইঁহাদের কথা শুনিতে হইবে; ইহাতে সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে চলিবে না।

বিষ্ণু বৈদিকযুগের মস্ত বড় দেবতা; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহার উপাসনা চলিত। ইঁহার স্থান বৈদিক দেবমণ্ডলে প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই বোধ হয় জানেন্, আর্য্যেরা অতি-প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম হইতে ও মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই বংশধরেরা বিভক্ত হইয়া পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। অনেক গবেষণার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে, আর্য্যদিগের আসিবার পূর্ব্বে এবং পরেও আরও অনেকদল যাযাবর-জাতি উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারাই অথর্ব্ববেদে ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গুলিতে "ব্রাত্য" বলিয়া পরিচিত। উঁহাদের আচার-ব্যবহার ঠিক আর্য্যদিগের মত ছিল না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন, যা' তা' করিতেন। যা' তা' খাইতেন, বনে জঙ্গলে বেড়াইতেন, ধনুকের বদলে বাঁক

লইয়া যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের ঘোড়ার জিন ছিল না ও লাগাম ছিল না। এইরূপ আরও কত কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার আছে। সে-কথা আমার এখানে বলিবার দরকার নাই। মোট কথা, শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা। অথর্ব্ববেদ ব্রাত্যদিগের বেদ। শিবের নাম ঋগ্বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে নাই; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা বলেন এই অহিন্দু দেবতাকে অতিকষ্টে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-দিগের দেবমণ্ডলে স্থান পাইতে হইয়াছিল। দক্ষ-যজ্ঞের সেই ভয়ানক ব্যাপারে অনেক রক্ত-পাতের পর, তিনি ব্রাহ্মণ্যদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ব্রাত্যদিগেরও মধ্যে যাহারা ব্রাত্যস্তোম-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদের ব্রাত্যাবস্থার আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন করিত এবং বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্র মগধ-দেশবাসী ব্রাত্যদিগকে দান করিত, তাহারাই আর্য্যদিগের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিত।

বিষ্ণুর স্থান বহুকাল হইতে উচ্চ ছিল, এখনও রহিল। শিবঠাকুরের উপাসক অনেক থাকায় তিনিও এক প্রধান দেবতা হইয়া রহিলেন। সৃষ্টির আদি-কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল। উপনিষদে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে হইল। অতএব তাঁহাদের স্থান প্রায় সমান সমান হইল। তখন ব্রহ্মার কার্য্য হইল সৃষ্টি করা, বিষ্ণুর হইল সৃষ্টি রক্ষা করা, শিব এ-দিকে সংহার লইয়া থাকিলেন। বোধ হয়, এই সময়েই প্রথম ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা হইল। এ-সমস্ত দার্শনিকদের কীর্ত্তি। তিনই বড়, কাহাকেও ছাঁড়িবার উপায় নাই;—সুতরাং তিন জনকেই এক করিয়া দেওয়া হইল। বোধ হয়, এই সময়েই বৌদ্ধেরা ব্রহ্মাকে তাঁহাদের ভিতর টানিয়া লন। বুদ্ধদেব যখন সম্বোধি লাভ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল আর এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? তিনি মহাপ্রয়াণের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহার কাছে আসিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আপনি যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা পৃথিবীর লোককে উন্নত করিতে হইবে, এই জ্ঞান সমস্ত মানবের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। যতদিন না তাহা করিবেন, ততদিন পৃথিবীতে আপনার কার্য্য সমাপ্ত হইবে না।' বুদ্ধ অগত্যা তাঁহার মহাপ্রয়াণ ৪৫ বৎসরের জন্য স্থগিত করিলেন।

এই সময় হইতেই ব্রহ্মার পূজা আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই তাঁহার নামে মন্দির গড়া আরম্ভ হইল। সে আজ প্রায় ২৬০০ বৎসরের কথা। কিন্তু পুরাণে তাঁহার পূজার কথা, মন্দির গড়ার কথা পাওয়া যায় না। এখন ব্রহ্মার মন্দির নাই বলিলেই চলে। এখন পূজা করে কে?—হালুইকর বামুনেরা আর বারোয়ারীর পাণ্ডারা। এরূপ হইল কেন? অত বড় দেবতা, ত্রিমূর্ত্তির প্রথম দেবতা। তাঁহার পূজাটা হঠাৎ কি করিয়া লুপ্ত হইয়া গেল।

উত্তরে বলিব, দার্শনিক দেবতাদের অবস্থাই এই রকম। কত দার্শনিক দেবতা আজ বড় হইতেছেন, কাল তাঁহার নামগন্ধও নাই; আবার কত দেবতার কেউ নামও শুনে নাই, হঠাৎ কোন্‌দিন একজন মস্ত বড় দেবতা হইয়া

সকলের মন জুড়িয়া বসিয়া আছেন! ব্যাপার আর কিছুই নয়, যাঁর যত বেশী উপাসক সেই তত বড়; আর যে দেবতার ভক্তের অভাব, তাহার প্রভাব কিছুকাল পরে বিনষ্ট হইয়া যায়। তা ছাড়া দর্শনের মতও রোজ বদলাইতেছে। এক মতে একটি দেবতা বড় হইল; দু'পাঁচ শত বৎসর পরে তাহারাই মত বদলাইয়া ফেলিয়া পূর্ব্বেকার দেবতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আর এক নূতন দেবতা বসাইয়া দিল।

মেগাস্থিনিস্ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যখন চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে বাস করিতেন, তখন ভারতের লোক মোটামুটি দুই-ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা বিষ্ণুর পূজা করিত তাহারা বৈষ্ণব-নামে পরিচিত ছিল, আর যাহারা শিবের আরাধনা করিত তাহারা শৈব-নামে অভিহিত হইত। অতএব ব্রহ্মার উপাসক কেহ ছিল না। তা ছাড়া পূর্ব্বে বলিয়াছি, দার্শনিক দেবতাদের দশাই এই। অতএব ব্রহ্মার উপাসনা করিতে তখন কেহ ছিল না। তা ছাড়া বৌদ্ধদের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই ব্রহ্মার প্রভাব কম হইতে লাগিল; ক্রমে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্রহ্মার পূজার লোপ-সম্বন্ধে এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মজার কথা এই যে, পুস্তকারেরা জিনিষটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বা না করিয়া, নানারকমের অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিরকম অদ্ভুত, তাহার দুই একটির নমুনা দিই।—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায়, মোহিনী-নামধেয়া এক রমণী একদিবস নির্জ্জনে ব্রহ্মাকে পাইয়া তাঁহাকে প্রণয়াভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ লোক, সৃষ্টিকর্ত্তা! অনেক করিয়া তিনি মোহিনীকে তাহার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মোহিনী ব্রহ্মার পূর্ব্বচরিত্রের নানাবিধ কথা নানাপ্রকারে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে একটু ফিরাইয়াছিলেন। তিনি সম্মত হ'ন হ'ন, এমন সময় ঋষিরা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত। তখন ব্রহ্মা আত্মসংবরণ করিয়া তীব্রভাবে মোহিনীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মোহিনী হঠিবার পাত্র নয়;—সেও অভিসম্পাত দিল, "তুমি যখন অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমার কথায় সম্মত হইলে না, তখন তোমার পূজা আর পৃথিবীতে কেহ করিবে না।" এই শাপ ফলিয়া গেল, তাঁহার পূজাও লোপ পাইল।

পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, একদিবস ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনাদের মধ্যে কে বড়, ইহা লইয়া ভীষণ কলরব করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়া তথায় উপস্থিত। তিনি শুনিয়াই বলিলেন, 'আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়; আর তোমাদের মধ্যে যে আমার জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আদি বা অন্ত দেখিয়া আসিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে।' এই বলিয়া শিব জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আনয়ন করতঃ তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মা হাঁসের উপর চড়িয়া ভীষণবেগে উপরে উড়িতে উড়িতে অগ্রভাগ সন্দর্শন করিতে গেলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধরিয়া দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নামিতে লাগিলেন। কত-

কাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। বিষ্ণুর দাত আর চলে না। তিনি ধীরে ধীরে উপরে আসিয়া শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা সহজে হটিবার পাত্র নহেন। তাঁহার হাঁস অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে; বেগও মন্দ হইতে মন্দতর মন্দতম হইয়া আসিয়াছে। বেজার হইয়া তিনি ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন ভক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকচ্যুত হইয়া নামিতেছে। হঠাৎ ব্রহ্মার মাথায় এক দুরভিসন্ধি চাপিল। কেতকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আগা পাওয়া অসম্ভব। তখন ব্রহ্মা তাহাকে শিবের সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ফুলের প্রাণ, কত সহ্য হয়! পাছে ব্রহ্মার মত অত বড় দেবতার শাপে পড়িয়া কোন বিপদ্ হয়, এই ভয়ে সে রাজী হইল। তখন ব্রহ্মা কেতকীকে সঙ্গে করিয়া শিবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, অগ্রভাগ তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং এই কেতকী তাঁহার সাক্ষী। শিব বুঝিলেন, ব্রহ্মা মিথ্যা বলিতেছেন। কারণ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার লিঙ্গ অনাদি অনন্ত; ব্রহ্মার কি ক্ষমতা তাহার আদি দেখিয়া আসে, বিষ্ণুর কি ক্ষমতা তাহার অন্ত দেখে! তিনি ক্রোধে জলিয়া ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন, "যেহেতু অবোধ বালকের ন্যায় তুমি আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে, সেই-হেতু অতঃপর তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী দেবতার পূজা আর কেহ করিবে না।" ব্রহ্মার পূজা লুপ্ত হইয়া গেল। কেতকীকে শিব শাপ দিলেন, 'যে-হেতু তুমি আমার প্রিয় পুষ্প হইয়াও অপরের প্ররোচনায় আমারই কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সেই-হেতু আজ হইতে আমার বা অন্য কাহারও পূজায় তোমার ব্যবহার হইবে না।" কেতকী একেবারে স্তম্ভিত! "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"-যখন সে বুঝিতে পারিল, তখন সে বিনাইয়া বিনাইয়া শিবের কাছে অনেক কাঁদিল। শিব ভোলানাথ, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা! কেবল শিবচতুর্দ্দশীর বা শিবরাত্রির রাত্রে আমার পূজায় তোমার ব্যবহার হইবে। মাত্র সেই রাত্রের জন্য তুমি আমার প্রিয় হইবে। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।' কেতকী আস্তে আস্তে বিদায় লইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

বিপুলার সাধনা।

শারদ পূর্ণিমা নিশা, শুভ্র জ্যোছনায়
সদ্যঃস্নাতা বিশ্বরাণী বিহ্বল-হিয়ায়
মগ্ন ছিল সুখধ্যানে। সহচরীগণ
আমারে পরায়ে দিল রত্ন আভরণ
কত স্নেহে কি পুলকে,—ষড়্ঋতু যেন
সাজাল ধরার অঙ্গ! হায়! হ'বে কেন

কে জানিত? কে জানিত, জীবন আমার
হবে ম্লান-পুষ্প-সম লাঞ্ছিত সবার!
আজি মনে পড়ে মোর সে মধুযামিনী
কি আবেশে আত্মহারা আমি উন্মাদিনী
বধূবেশে ছিনু সাজি! পিতার ভবন
কোলাহল-মুখরিত ছিল অনুক্ষণ